ISSN: 2790-2668

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

GRAPHIC DESIGN JOURNAL

বর্ষ ০১ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর ২০২১
Year 01 Issue 01 December 2021

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

Graphic Design Journal

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল

বর্ষ ০১ . সংখ্যা ০১ . ডিসেম্বর ২০২১
Year 01 . Volume 01 . December 2021

সম্পাদক
মামুন কায়সার

সহকারী সম্পাদক
মো. মাকসুদুর রহমান
রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রাফিক ডিজাইন জার্নাল
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
প্রকাশকাল : ২৯ ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক
অধ্যাপক মামুন কায়সার

প্রকাশক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক :

প্রচ্ছদ : মো. মাকসুদুর রহমান
অঙ্গসজ্জা : ফারজানা আহমেদ

মূল্য : ২৫০ টাকা
USD : 10.00

Graphic Design Journal edited by Professor Mamun Kaiser. Published by Department of Graphic Design, Faculty of Fine Art, University of Dhaka.
Ph : PABX No. 9661920-73 Extn 8589, 8588 E-mail : graphicdesign@du.ac.bd

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মামুন কায়সার
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. ইসরাফিল প্রাং
চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. মাকসুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম
সহযোগী অধ্যাপক গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কোনো তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের জন্য সম্পাদনা পরিষদ দায়ী নয়। এ-সংক্রান্ত সকল দায়-দায়িত্ব একান্তই লেখকের।

সূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ মনোগ্রাম
রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম ০৯ ।

দৈনিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলঙ্করণ: স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (১৯৭২-২০০০)
ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার ২৪ ।

শিশুর মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা
ভদ্রেশু রীটা ৬৪ ।

বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদসৃজনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কনশৈলী
ড. মলয় বালা ৮৫ ।

বিজ্ঞাপন প্রচারে গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিকতা
ড. সীমা ইসলাম ৯৭ ।

সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রা নকশা পর্যালোচনা
ড. ফারজানা আহমেদ ১১২ ।

কাগজের কারুশিল্প
মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন ১৪৮ ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ মনোগ্রাম

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম*

সারসংক্ষেপ : মনোগ্রাম যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিহ্নায়ক এর মনোগ্রাম। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি বিদ্যায়তন নয়, এটি একটি জনপদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্থান ও বিবর্তনের ১০০ বছরের সাক্ষী। এ সাক্ষ্যের প্রামাণ্য উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে এর মনোগ্রামের মাঝেও; যা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান হয় প্রণীত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনবার এই মনোগ্রামের রূপ-নকশা পরিবর্তনের ফলে। সময়ের সাথে সাথে এই নকশার পরিবর্তিত রূপ এবং এর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট মূলত এখানে আলোচ্য বিষয়। এছাড়া চিত্রানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সকল মনোগ্রামে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান যেমন-রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সংগ্রামের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বাঙালি জাতিরই ইতিহাস। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে তা আমাদের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ও জীবনধারার মানোন্নয়নে সর্বজনীন স্বীকৃতি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পেয়েছে। জাতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং মননশীলতা ও বিজ্ঞানচর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অতুলনীয়। এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ এবং উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গৌরবোজ্জ্বল এই বিশ্ববিদ্যালয় শতবৎসর পূর্ণ করেছে (১৯২১-২০২১)। যে ভূখণ্ডে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ঠিক ৫০ বছরের মধ্যে সেই ভূখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে (সূত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট)। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি বিদ্যায়তন নয়, এটি একটি জনপদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্থান ও বিবর্তনের ১০০ বছরের সাক্ষী। এ সময়কালীন বিভিন্ন প্রকাশনা, প্রচার ও সম্প্রচার মাধ্যমে এ সাক্ষ্যের প্রামাণ্য উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটি একটি প্রধান চিহ্নায়ক। কিন্তু এই প্রতীকটি প্রণীত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনবার এর রূপ-নকশাটি পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রাম ও তার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেহেতু মনোগ্রাম একটি প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরে এবং প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং চিত্রানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

প্রাচীন ভারতে বেশ কয়েকটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের সেসব প্রতিষ্ঠানে মূলত ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা দেয়া হতো। তেরো শতকে দিল্লীতে সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নব যাত্রার উন্মেষ ঘটে; গড়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার নতুন কেন্দ্র। সুলতানী ও মোগল আমলে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি দর্শন, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির চর্চা হয়েছে। সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের পণ্ডিতগণ জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট থেকে শিক্ষা দান করে গেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা, বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) ও

মাদ্রাজে। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৫৭ সালের ১৮ জুলাই বোম্বে (মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৫৭ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূত্রঃ https: //www. caluniv.ac.in;https://admi.mu.ac.in/about-university.html; https://www.unom.ac.in)। এর ৬৪ বছর পর ১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; যার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় একই বছরের ০১ জুলাই থেকে। এটি বাংলাদেশের তথা পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল। একটি রাজনৈতিক আর অন্যটি অ্যাকাডেমিক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চল নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ গঠন হয়। ঢাকাকে করা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেকালে সারস্বত সমাজের বিরোধিতার কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। নতুন প্রদেশ আর থাকে না, ফলে ঢাকা হারায় প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য, বিশেষ করে সাধারণ অবহেলিত মুসলমান সমাজের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশ বিলুপ্ত হলেও এ অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আদৌ যেন বন্ধ না হয়, সে-বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানানো হয়। সে-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ আরও অনেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অভিমানজনিত বেদনার উপশম করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ-ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। দ্বিতীয় কারণটি সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক। ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চেয়েছিল ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে কলকাতার বাইরে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে ; এজন্য কর্তৃপক্ষ ঢাকাকে বেছে নেয়। এর পিছনে হয়তো কয়েকটি কারণ কার্যকর ছিল- প্রথমত ঢাকা ছিল পুরোনো ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ নগর। দ্বিতীয়ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অ্যাকাডেমিক ভার থেকে খানিকটা রেহাই দেওয়া। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ঢাকা শহরে অবস্থিত কলেজগুলোর দেখভালের দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। সে-সময়ে ঢাকাতে দু'টি প্রতিষ্ঠিত অগ্রগণ্য কলেজ ছিল; বেসরকারি জগন্নাথ কলেজ ও সরকারি ঢাকা কলেজ (সূত্র : রহিম, ১৯৮১; অজয়, ২০১৩; মাসুম, ২০১৯; মকসুদ, ২০১৬; আয়শা, ২০১১)।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক : মনোগ্রাম

'Mono' শব্দের অর্থ 'এক'। কোনো প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নামের প্রথম অক্ষর, মর্যাদাপূর্ণ চিহ্ন, স্বতন্ত্র বা সমন্বিত কম্পোজিশনে নকশার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব ও পরিচিতিমূলক দৃশ্যগত প্রতীকই মনোগ্রাম। বিভিন্ন অভিধানের শব্দার্থ অনুযায়ী Monogram-এর আভিধানিক অর্থ–

> দুই বা ততোধিক বর্ণ (বিশেষত নামের আদ্যক্ষর) জড়িয়ে তৈরি করা নকশা (যা রুমাল, নোটের কাগজ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়)।
>
> যে নকশায় কয়েকটি জড়ানো অক্ষর (বিশেষত : কোনো লোকের নামের আদ্যক্ষরসমূহ) খোদাই করা থাকে ; A set of letters, symbol, usually formed from the first letters of a person's names joined together, that is sewn or printed on clothes or other possessions.
>
> A motif of two or more interwoven letters, typically a person's initials, used to indentify a personal possession or as a logo. A design composed of one or more letters, typically the initials of a name, used as an identifying mark.

মনোগ্রামের বিভিন্ন পরিভাষাও রয়েছে, যেমন : সিল, প্রতীক (Emblem), লোগো, ক্রেস্ট, শিল্ড, ইনসিগনিয়া ইত্যাদি।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের নমুনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এম. এ. রহিম-এর *The History of The University of Dacca* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ থেকে জানা যায়- ১৯২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (বর্তমান সিন্ডিকেট)-এর প্রথম সভাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিল বা মনোগ্রাম তৈরি করার বিষয়টি বিবেচিত হয় এবং কাউন্সিল একটি প্রস্তাব দ্বারা উপযুক্ত লিপিসহ মনোগ্রাম তৈরির জন্য উপাচার্য মহোদয়কে নির্দেশ দেয়ার অনুমতি দেয়। উক্ত সভাতেই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশে 'Truth Shall Prevail' কথাটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গ্রহণ করে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র (Motto) হিসেবে গৃহীত হয়। এই মনোগ্রাম বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট ২০২০-এর ধারা ৩ (২)-এ উল্লেখ আছে- "The University shall have perpetual succession and common seal" (সূত্র : রহিম, ১৯৮১ : ২১)।

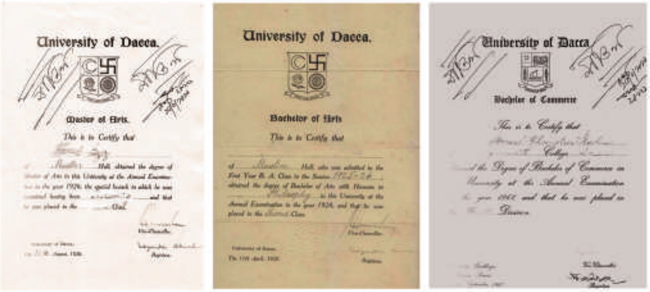

১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৬১ সালে তিন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত
শিক্ষা সনদে ব্যবহৃত দুটি মনোগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চারটি চিহ্নসহ 'Truth Shall Prevail' লেখা একটি প্রতীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই মনোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী সময়ে এ মনোগ্রাম আরও তিনবার পরিবর্তন করা হয়। প্রথম মনোগ্রাম থেকে তৃতীয় মনোগ্রাম ছিল শুধু এক রঙে রেখার সাহায্যে নকশা করা। বর্তমান মনোগ্রামে তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছে–গাঢ় নীল জমিনে লাল ও সোনালি রং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৩, প্রতিষ্ঠার ৯২ বছর' নামে স্যুভেনিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ছবি ছাপা হয়েছে (সূত্র : সৈয়দ রেজাউর, ২০১৩ : ২৩)। সেখানে দেখা যায় বর্তমান মনোগ্রামের নীল রঙের সাথে মিলিয়ে পূর্ববর্তী তিনটি মনোগ্রামের জমিনে গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল নকশা, প্রতীক, চিহ্ন, লেখা, রেখা ইত্যাদি উপাদান রিভার্স অর্থাৎ সাদা রংয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৩, প্রতিষ্ঠার ৯২ বছর' নামে স্যুভেনিরে মুদ্রণকৃত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের মনোগ্রাম

নিম্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আলোচিত হলো :

প্রথম মনোগ্রাম (১৯২১-১৯৫২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত প্রথম নকশাকৃত মনোগ্রামটি (চিত্র নং-১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল (১৯২১-১৯৫২ সাল অব্দি) থেকে পরবর্তী ৩১ বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি একাধিক প্রতীক সংবলিত মনোগ্রাম ; যেখানে চারটি চিহ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে যার তিনটি সরাসরি তিন ধর্মের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

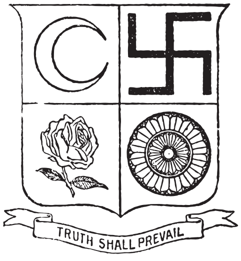

চিত্র : ১
১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মনোগ্রাম

শিল্ড (Shield-ঢাল, আত্মরক্ষার আবরণ) আকৃতিতে করা প্রথম মনোগ্রামটির মাঝ বরাবর উলম্ব (Vertical) ও অনুভূমিক (Horizontal) দুটি লাইনে সমানভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উপরিভাগের বাম দিকে অর্ধচন্দ্র (Crescent), ডানে স্বস্তিকা (Swastika) এবং নিচের অংশে বামে গোলাপ ফুল ও ডানে অশোক চক্র (Ashoka Chakra)। একদম নিচে ফিতা (Ribbon) আকৃতির ভেতরের অংশে ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো-'TRUTH SHALL PREVAIL' বাক্যটি লেখা রয়েছে ; বাংলায় যার অর্থ হিসেবে বর্ণিত হতে পারে 'সত্য বিরাজমান'। মনোগ্রামটিতে বিভিন্ন চিহ্ন ও মটিফ সংযুক্ত হয়েছে।

অর্ধচন্দ্র (Crescent) : এখানে সম্পূর্ণ গোল বৃত্তকে অর্ধচন্দ্রের রূপ দেয়া হয়েছে। এই আকৃতির প্রতীকটি আঁকা হয়েছে মনোগ্রামে অঙ্কিত চতুষ্পার্শ্বের রেখার একই পুরুত্বে। এখানে উল্লেখ্য যে, চাঁদ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি প্রতীক হিসেবে পরিচিত (সূত্র : www.britannica.com)। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে এই চিহ্নটি ব্যঞ্জনাময়।

স্বস্তিকা (Swastika) : মনোগ্রামের উপরের অংশে ডান দিকে ভরাট মোটা লাইনে স্বস্তিকার চিহ্ন আঁকা হয়েছে যা উপমহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এখানে যে স্বস্তিকা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ডানমুখী প্রতীক (Right facing symbol) '卐'। এর অর্থ সূর্য (সূত্র : https : // en.wikipedia.org / wiki / Swastika); যা হিন্দুইজমের প্রতিনিধিত্ব করে।

অশোক স্তম্ভে খোদাইকৃত চক্র

অশোক চক্র (Ashoka Chakra) : বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্ন। এই চিহ্নকে ভিত্তি করে মনোগ্রামে চারটি বৃত্ত দিয়ে নকশার রূপরেখা করা হয়েছে। অশোক স্তম্ভে যেরকম নকশা দেখা যায় সেরকম হুবহু রূপ দেয়া হয়নি, বরং এখানে নকশাকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। চক্র অঙ্কিত প্রান্ত রেখা ও মধ্যবর্তী বৃত্তের মাঝে আর্চ

জাতীয় নকশা পরপর একইভাবে গোল করে সাজানো। মাঝের বৃত্তে ওই একই নকশার পুনরাবৃত্তি (যেহেতু এখানে জায়গা কমে এসেছে তাই নকশা ও রেখার ঘনত্ব ছোট ও কম)। অশোক চক্রের কেন্দ্র বিন্দু থেকে প্রথম যে ছোট বৃত্ত শুরু হয়েছে সেখানে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে।

গোলাপ ফুল (Rose) : একটি ডালে দুটি পাতা সমেত ডানমুখী ফুল। ফুল ও পাতার চরিত্র বলে দেয় এটা গোলাপ। এটি আলোচিত মনোগ্রামের নিচে বাম পাশের অংশে রেখার সাহায্যে আঁকা, কোনো ভরাট বা মোটা লাইন নেই। এখানে গোলাপফুলের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ; যা সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয় মনোগ্রাম (১৯৫২-১৯৭২)

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। সেই সাথে বঙ্গদেশকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দিয়ে নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুটি অংশে বিভক্ত থাকে পাকিস্তান নামের একটি দেশ। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের (চিত্র নং-২) নকশায় বদল এনে একসঙ্গে ইসলামি ও বাঙালি চরিত্র দেয়া হয়। একটি দেশ দুই ভাগে বিভক্ত-দুই অংশের ভাষা, আচার, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। এই বিভক্তিকরণ স্পষ্টভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রামের নকশাতে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা' বইতে বিধৃত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়-১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগা খানকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয় ; যেখানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অ গংষরস টহরাবৎংরঃু হিসেবে অভিহিত করেন। নব-প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণি এই বক্তব্যে হৃষ্টতা অনুভব করলেও প্রগতিশীল

চিত্র : ২
১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রাম

বাঙালি তাতে বিব্রত বোধ করে। ফলে এই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র *মর্নিং নিউজ* সংবাদপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের ছবি নিয়ে মন্তব্য করে–

> "There are four emblems on it: A Swastika, typifying Nazi & Hindu cultures, a Lotus, the Hindu symbol of learning, an Asoka Chakra (wheel) and of course, to appease Muslims, a crescent. The crest first adopted in 1921, when the Dacca University was founded, still continues to be the emblem for the advancement of learning in the Muslim state of Pakistan." (সূত্র : মকসুদ, ২০১৬ : ১৪২)

যেহেতু নতুন রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে মুসলিম গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান বাঙালি জাতি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে, সেহেতু এই মনোগ্রামের নকশায় মুসলিম ও বাঙালি চরিত্র একত্রে উপস্থাপন করা হয়।

আলোচ্য মনোগ্রামের (চিত্র নং-২) ওপরের ডানের অংশে রেহেলের উপর উন্মুক্ত কিতাব, সেখানে আরবিতে লেখা ; "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব" (অর্থ: তোমার প্রভুর নামে পড়ো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)। বাঁয়ে উল্লম্বভাবে (Vertical) পাকিস্তানের চাঁদ-তারকাশোভিত পতাকা। নিচের অংশে বাঁয়ে একটি পাটগাছ, ডানে ধানশিষ। মাঝের অংশে পানিতে ভাসমান নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতীক পালতোলা নৌকা। নৌকার নিচের আঁকাবাঁকা দুটি রেখা দিয়ে নদীর ঢেউ বোঝানো হয়েছে। শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী মনোগ্রামটির নকশা এঁকেছেন তৎকালীন ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শিল্পী আনোয়ারুল হক। প্রথম মনোগ্রামের মতোই এটিও শিল্ড (ঝযরবষফ) আকৃতির, তবে প্রথমটার চেয়ে কিছুটা লম্বাটে। এখানে পাঁচটি প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে এবং প্রতিটিই একই ঘনত্বের লাইনে উপস্থাপিত। ওপরের অংশ দুই ভাগে এবং নিচের অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। একদম নিচে শিল্ডের ফিতা (Ribbon)-এর মাঝে ইংরেজিতে লেখা 'UNIVERSITY OF DACCA'। উল্লেখ্য যে, প্রথম মনোগ্রামে প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা ছিল না। প্রতিষ্ঠার ৩১ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে নিজস্ব নাম যুক্ত হয়।

মনোগ্রামটিতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর বর্ণনা–

পবিত্র গ্রন্থ : এই মনোগ্রামে দেখা যায় ওপরের অংশের ডান পার্শ্বে অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে অনুভূমিকভাবে খোলা উন্মুক্ত গ্রন্থ, যার অবস্থান একটি রেহেলের উপরে। গ্রন্থের দুই পাতা জুড়ে আরবি ক্যালিগ্রাফি শৈলীতে লেখা পবিত্র কোরআন-এর বাণী "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ক"। লিখিত বাণী পবিত্র কোরআন -এর এবং গ্রন্থটির অবস্থান রেহেলের ওপরে হওয়ার কারণে সহজেই প্রতীয়মান যে এটি একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । গ্রন্থ, রেহেল ও ক্যালিগ্রাফির সবই একইরকম সমাকীর্ণ রেখার সাহায্যে অঙ্কিত। গ্রন্থ অঙ্কনে কয়েকটি রেখা দিয়ে অনেক বেশি পৃষ্ঠা সংবলিত মোটা ধরনের বই বোঝানো হয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা : মনোগ্রামের ওপরের অংশের বাম পাশে উলম্বভাবে পাকিস্তানের চাঁদ-তারকাশোভিত পতাকা রেখার মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। মূল পতাকার নকশা অনুভূমিক। সাধারণত কোনো স্থানে জাতীয় পতাকা বা পতাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হলে সম্মানজনক ও সতর্কভাবে তা ব্যবহার করা হয় ; এখানে এর ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। অনুভূমিক (ঐড়ৎরুড়হঃধষ) নকশার পতাকাকে উলম্বভাবে (ঠবৎঃরপধষ) আঁকা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন পতাকাটি মনোগ্রামে জোর করে বসানো হয়েছে। তাতে পতাকায় শোভিত চাঁদ ও তারকার চিহ্নটি ৯০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। পতাকার দুটি রং বোঝাতে একটি লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। পতাকায় অঙ্কিত চাঁদ-তারাসহ অন্যান্য রেখা একই ঘনত্বে আঁকা ।

ধান, পাট ও নৌকা : বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। এই জনপদের ৮০% মানুষ সরাসরি কৃষিকাজ ও কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃত্তির সাথে জড়িত। ধান এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য এবং পাট চাষের জন্য চিরকাল উর্বর এ দেশের মাটি। তৎকালে পাট চাষের পাশাপশি গড়ে উঠেছিল বেশকটি পাটকল প্রতিষ্ঠান; যেখানে তৈরি পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি হতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পাশাপাশি এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদীতে পরিপূর্ণ। তাই এই নদীমাতৃক অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক জীবনের কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রামের নকশাতে ধান, পাট, নদী ও নৌকার চিহ্নে বিধৃত হয়েছে।

তৃতীয় মনোগ্রাম (১৯৭২-১৯৭৩)

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মনোগ্রামের নকশা করা হয়; যেখানে খোলা বইয়ের বুকে 'শিক্ষাই আলো' কথাটি এবং বইয়ের নিচে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি স্থাপিত হয়েছে। এ নকশায় বইয়ের উপরে জাতীয় ফুল 'শাপলা' ও আলোর বিচ্ছুরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে উপযুক্ত একটি নকশা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানকে নতুন মনোগ্রামের ডিজাইনের দায়িত্ব দেন। (সূত্র : শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী'র সাথে আলাপচারিতা, ৩০ জানুয়ারি, ২০২১)। উন্মুক্ত বইয়ের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত মনোগ্রামের মূল নকশার মাঝ বরাবর লেখা 'শিক্ষাই আলো' বাণী। খোলা বইয়ের ওপরে মধ্য কম্পোজিশনে (Middle composition) অনেকটা প্রজ্বলিত প্রদীপের মতো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। এর চারপাশে ওপরে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছোট-বড় সরলরেখায় অর্ধবৃত্তাকারভাবে বিন্যস্ত আলোক রশ্মি। নিচে পুষ্ট হরফে ইষৎ বক্রভাবে বাংলায় লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী ছিল এই মনোগ্রাম। প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অপছন্দ ও তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবার মনোগ্রামের নকশায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেন।

চিত্র : ৩
১৯৭২-১৯৭৩ সালে ব্যবহৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় মনোগ্রাম

বর্তমান মনোগ্রাম (১৯৭৩-বর্তমান পর্যন্ত)

১৯৭৩ সালে পুনরায় পরিবর্তিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটিতে পূর্ববর্তী মনোগ্রামের মতোই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখা হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো- 'শিক্ষাই আলো' বাণী এবং জাতীয় ফুল শাপলাও বহাল রয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পূর্বের তিনটি মনোগ্রাম ছিল শুধু কালো রেখার মাধ্যমে নকশা করা। বর্তমান মনোগ্রামটি রঙিন; যেখানে তিনটি সলিড রং ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মনোগ্রামের নকশাকার শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী'র সাথে সরাসরি কথোপকথনের (৩০ জানুয়ারি, ২০২১) মাধ্যমে জানা যায়-পুনরায় মনোগ্রামের ডিজাইন করার জন্য তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে উপাচার্য নিজে এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে-সময়ে মনোগ্রামের নকশা জমা দিয়েছিলেন-শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং শিল্পী রফিকুন নবী। কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী ডিজাইনকৃত বর্তমান মনোগ্রামের নকশাটি বাছাই করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ অবধি উক্ত মনোগ্রামটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক হিসেবে গৌরবের সাথে বহাল রয়েছে।

চিত্র : ৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বর্তমান মনোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মনোগ্রামের মতো এই মনোগ্রামও শিল্ডের আকৃতিতে করা, তবে এখানে নিচের অংশে মিল থাকলেও উপরের দিকে উলম্ব (Vertical) রেখা গিয়ে চতুর্ভুজ/বর্গাকার আকার নিয়েছে। নকশার মাঝ বরাবর অনুভূমিক (Horizontal) রেখা টেনে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচের অংশ আবার মাঝ বরাবর একটি উলম্ব (Vertical) রেখা দিয়ে দুই ভাগ করা হয়েছে। গাঢ় নীল রঙের জমিনের চারিদিকে সোনালি লাইনের বর্ডার, মাঝের দুটি উলম্ব ও অনুভূমিক রেখার রং সোনালি। উপরের অংশে লাল রঙের আলোকশিখা, তার পাশে সাতটি ছোট ছোট রিভার্স লাইনে আলোর বিচ্ছুরণ, আলোকশিখার উপরে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা 'শিক্ষাই আলো'। নিচের অংশের বামদিকে জাতীয় ফুল শাপলা, সাদা রিভার্সে। সোনালি রঙের রেখা দিয়ে ফুলের চিহ্নটি আঁকা হয়েছে।

ফুলের নিচে পানির চিহ্নরূপ দুইটি সমান্তরাল তরঙ্গরেখা। জ্ঞানদৃষ্টির প্রতীকরূপে ডান পাশে একটি চোখের ফর্ম, এর গোল মণির মধ্যে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'অ' লেখা রয়েছে। একদম নিচে লাল ফিতায় সাদা রিভার্সে বাংলায় লেখা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। মনোগ্রামের নকশায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নগুলো নিয়ে ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী বলেন :

> 'শিক্ষাই আলো' কথাটির জন্য আলোকশিখা এনেছি। চোখ এনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতীক হিসেবে। চোখের মাঝখানে রেখেছি স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর; মাতৃভাষার জন্য ছাত্রদের অবদানের কথা ভেবে। ফুল এসেছে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে। শাপলা যেহেতু জাতীয় ফুল তাই অন্য ফুলের কথা ভাবিনি। এখানে নীল রঙের ব্যবহার করেছি পরিচ্ছন্নতা বোঝাতে। লাল এসেছে আমাদের পতাকার লাল থেকে, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা স্মরণ করে।" (শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা, ৩১ জানুয়ারি, ২০২১)

উল্লেখ্য, মনোগ্রামে ব্যবহৃত সোনালি রঙের কোনো ব্যাখ্যা শিল্পী এতদিন পর স্মরণ করতে পারেননি। তবে তিনি ধারণা করেন-"তখন হয়তো সোনার বাংলা বোঝাতে চারিদিকে সোনালি রঙের একটা বেষ্টনী দিয়েছিলাম, সে-ভাবনা থেকেই সোনালী রঙের রেখা ব্যবহার করেছি।"

মনোগ্রাম যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে শুরু থেকেই তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে আছে। দুঃখের বিষয়, পুরোনো কাগজপত্র রক্ষাণাবেক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হয়তো একটি সময় কিছু রক্ষিত ছিল, পরবর্তীকালে তা-ও অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। নকশায় পুনঃপুন বদল এলেও এর তেমন কোনো লিখিত নথিপত্র পাওয়া যায়নি। ১৯২১ সালের প্রথম মনোগ্রামের ডিজাইনার কে, এর নকশায় অঙ্কিত প্রতীকগুলো কেন ব্যবহৃত হয়েছে-এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা ছিলো কি না এবং তৎকালে কোন সভা হয়েছিলো কি না, এসব বিষয়ে কোন দলিল বা নথিপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শাখায় সংরক্ষিত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে সংরক্ষিত পুরোনো পত্র-পত্রিকায় মনোগ্রাম সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শাখা, প্রশাসন-৫ (যেখানে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য তথ্যপত্র রক্ষিত থাকে) এবং ঢাকা বিশ্ববদিয়ালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ শাখা কোথাও এই সম্পর্কে কোনো তথ্য-প্রমাণ, দলিল বা নথিপত্রের সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া

যায়নি। পরবর্তী তিনটি মনোগ্রামের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়, সিদ্ধান্ত আকারে লিখিত কোনো ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। বর্তমান মনোগ্রামের ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাথে আলাপচারিতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় মনোগ্রামের ডিজাইনারের নাম এবং তৃতীয় ও বর্তমান মনোগ্রাম তৈরির সে-সময়ের ঘটনাবলি জানতে পারা যায়। শুধু প্রমাণ হিসেবে পাওয়া গেছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ এবং ৯২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত স্যুভেনিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ছাপানো ছবি। ২০১৩ সালে প্রকাশিত স্যুভেনিরে দেখা যায় বর্তমান মনোগ্রামের নীল রঙের সাথে মিলিয়ে পূর্ববর্তী তিনটি মনোগ্রামের জমিনে গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল নকশা, প্রতীক, চিহ্ন, লেখা, রেখা ইত্যাদি উপাদানগুলো রিভার্স অর্থাৎ সাদা রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০১২ সালে আরও ভয়াবহ অবস্থায় প্রকাশিত হতে দেখা যায় মনোগ্রাম। সেখানে জমিনে সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে প্রথম তিনটি মনোগ্রাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যতীত শুধু কালো রেখায় নকশাকৃত সেখানে এ ধরনের উদাসীনতা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের রুচিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বর্তমান সময়ে ও পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হিসেবে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত– হয় ছাত্র নয়তো শিক্ষক। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনকারী প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী। কিন্তু প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে ভৌগোলিক ও সামজিক পটপরিবর্তনের কারণে তিনবার যে মনোগ্রামের নকশায় পরিবর্তন এসেছে সবকিছুই হয়েছে হয়তো এককেন্দ্রিক; যা লক্ষ করা যায় বর্তমান মনোগ্রামের ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাথে আলাপচারিতায়। দেশভাগ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তৎকালীন উপাচার্যগণ নিজস্ব ভাবনা চিন্তা থেকেই হয়তো মনোগ্রামের নকশায় বদল আনার উদ্যোগে নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান মনোগ্রামের বিষয়ে ১৯৭৩ সালে একটি কমিটি করা হলেও সে-সম্পর্কে কোনো লিখিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়নি। যে প্রতীক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় বহন করে, সে-প্রতিষ্ঠানের উচিত উক্ত প্রতীক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে।

উপসংহার

মনোগ্রাম হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের মৌলিক চিহ্ন, যার মাধ্যমে মানুষের সাথে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দৃষ্টিগত যোগাযোগ ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোগ্রাম অঙ্কিত হয় আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে। এই অলংকারের নিহিতার্থ অনুধাবনের উপায় হিসেবে মনোগ্রামে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান যেমন-রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর ইত্যাদির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এসব উপাদানের চিহ্নতাত্ত্বিক অর্থ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কী বার্তা প্রদান করছে, সে-ভাষা শনাক্ত করাও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের ভাষা অনুধাবন করার চেষ্টা মানে রুচির চর্চা। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় হলো দেশের বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ চিহ্নায়ক। তাই এই চর্চা বৃদ্ধি পেলে হবে রুচির প্রসারণ। ফলে নতুন আঙ্গিকে তৈরি হবে ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রাম নকশা চিত্রণ।

তথ্যসূত্র

অজয় রায় (২০১৩)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পত্রিকা। জনসংযোগ দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আয়শা বেগম (২০১১)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : স্মৃতি নিদর্শন।* শস্যপর্ব, সিলেট।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) (২০০১)। অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বাঙালির আত্মপরিচয়। বর্ণায়ন, ঢাকা।

শেখ মাসুম কামাল (২০১৯)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ।* দ্যু প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৫)। *বাংলাদেশের সংস্কৃতি।* ঐতিহ্য, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা।* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ রেজাউর রহমান (২০১৩)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঐতিহ্যের ৯২ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পত্রিকা।* জনসংযোগ দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

M. A. Rahim (1981). *The History of the University of Dacca.* University of Dhaka.

দৈনিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (১৯৭২-২০০০)

ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার*

সারসংক্ষেপ : সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মানিতে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই পত্রিকা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, মাসিক থেকে পাক্ষিক, পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক এবং এক পর্যায়ে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পত্রিকা প্রকাশের শুরুতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য না থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হয়। শুরুতে সাদামাটা ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতি ও সহজলভ্যতা পত্রিকার সাদামাটা চেহারার পরিবর্তে নান্দনিকতায় ভরে ওঠে; যোগ হয় ইলাস্ট্রেশন ও ছবি। পত্রিকার চাহিদা যত বাড়ছে, অঙ্গসৌষ্ঠবও তেমনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পর্যায়ে মূল পত্রিকার বাইরে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে, যাকে ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা বলা হয়। এই ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদটি নানা রকম অলংকরণে শোভিত থাকে। প্রচ্ছদটি বরাবরই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কোনো বিখ্যাত শিল্পী বা নিয়োগপ্রাপ্ত ডিজাইনারকে দিয়ে আঁকানো হয়। কখনো প্রচ্ছদশিল্পীর নাম প্রচ্ছদপটে উল্লেখ থাকে, কখনো থাকে না। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র যেমন-দৈনিক 'সংবাদ, দৈনিক 'ইত্তেফাক', দৈনিক 'বাংলার বাণী', 'দৈনিক বাংলা' ও দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদপটের অলংকরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা

* অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, এই ক্রোড়পত্রগুলোর প্রচ্ছদ নানা অলংকরণে শোভিত থাকে। সাময়িকপত্রগুলো কখন থেকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে বিশেষ দিন বা অনুষ্ঠান, কারো আগমন উপলক্ষ্যে পত্রিকাগুলোর কোনো কোনোটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করত। এই বিশেষ সংখ্যা বর্তমান সময়ের মতো মূল পত্রিকার বাইরে আলাদাভাবে কতগুলো পৃষ্ঠা দিয়ে প্রকাশিত হতো না। অর্থাৎ সাময়িকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটির পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে ছবি ও বড় বড় অক্ষরে হেড লাইন দিয়ে লেখা থাকত। চিত্র নং-১, ১৮৮৯ সালের ৬ জুলাই, শনিবার 'দ্য ইলাস্ট্রেট লন্ডন নিউজ' (*The Illustrated London News*) পত্রিকাটি 'নাসের আল-দিন শাহ কাজার' (Nasser al-Din Shah Qajar)-এর ব্রিটেন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ফ্রন্ট পেজে নাসের আল-দিন শাহ কাজারের ছবি দিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। *The Illustrated London News* পত্রিকাটি ইংল্যান্ড থেকে ১৮৪২ সালের ১৪ই মে শনিবারে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটিতে ৩২টি উডব্লক ছাপা হয়েছিল।

চিত্র-১

Nasser al-Din Shah Qajar on the front page of *The Illustrated London News* during his last visit to Britain, 6 July, 1889.

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Herbert Ingram, তিনি ১৮১১ সালে ইংল্যান্ডের লিংকনশায়ারের বোস্টনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পত্রিকার সম্পাদক

ছিলেন Frederick William Naylor Bayley (1808-1853)।[১] The Penny Illustrated Paper (1861) নামক ইংল্যান্ড থেকে ১৮৬১ সালের ১২ অক্টোবরে প্রকাশিত পত্রিকাটি প্রথম অলংকরণসহ Ebenezer Farrington-এর দায়িত্বে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রিসমাস সংস্করণ প্রকাশ করে। যেখানে ক্রোমোলিথোগ্রাফ ব্যবহার করে পত্রিকাটির শোভাবর্ধন করা হয়।[২] পত্রিকাটি ১৯১৩ সালে প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় *The Illustrated Police News* এই পত্রিকাটি *The Illustrated London News* পত্রিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকাশনা শুরু করে। এভাবে দৈনিক পত্রিকাগুলো দিন দিন নানা রকমের সংবাদের পাশাপাশি ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার আরম্ভ করে এবং বিশেষ দিবসের জন্য কখন থেকে আলাদাভাবে ক্রোড়পত্র বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তা বলা যায় না, তবে বিশেষ দিন, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিয়ে তারা লিড নিউজ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাময়িক পত্রিকাগুলোতে নতুনমাত্রা যোগ করে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয় ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির স্ট্র্যাসবুর্গে। জোহান ক্যারোলাসের (Johann Carolus) মুদ্রিত *The German-language Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien* এবং প্রথম সফল ইংরেজি পত্রিকা *The Daily Courant* ১৭০২ সালে প্রকাশিত হয়।[৩] এর পর থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতবর্ষে প্রথম দিকে হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করত একদল নিবেদিত সাংবাদিক। পরবর্তী সময় মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। বলা যায় পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের কলকাতাতে হিকির বেঙ্গল গেজেটিয়ার ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ইংরেজিতে ছাপা। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বাংলা মাসিক সাময়িকপত্র ‘দিগদর্শন’ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।[৪] ঢাকার বাবুবাজারের বাঙলাযন্ত্রে মুদ্রিত ‘ঢাকাপ্রকাশ’

---

[১] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Illustrated_London_News, তারিখ : ২৫/১২/২০২০।

[২] https://en.wikipedia.org/wiki/Penny_Illustrated_Paper#cite_note-2, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

[৩] https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_newspaper_publishing, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

[৪] https://www.targetsscbangla.com/bengali-old-magazines, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

সাময়িকপত্রটির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম সচিত্র মাসিক সাময়িকপত্র 'বসন্তক' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্রাণনাথ দত্ত।[৫] সচিত্র সাময়িকপত্রটি মুদ্রণ ও প্রকাশনের দিক থেকে ছিল অনন্য। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৯৬ সালের ২৫শে আগস্ট সাপ্তাহিক 'বসুমতী' প্রকাশিত হয়, সাময়িকপত্রটি ১৯১৪ সালের ৬ই আগস্ট তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'দৈনিক বসুমতী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৬] বাংলা দৈনিক পত্রিকা হিসেবে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ১৯২২ সালে প্রকাশ শুরু হয়। এ সকল পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কোনো পত্রিকার ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

১৮৪৭ সালে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়। এই প্রেস থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রথম সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রের সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ রায়।[৭] ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে 'দি ঢাকা নিউজ' সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে ইংরেজিতে। ১৮৪৬ সালে ব্রজসুন্দর মিত্রের নেতৃত্বে ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৯ সালে ঢাকার বাবুবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাঙলাযন্ত্র'।[৮] ১৮৬১ সালে ৭ই মার্চ (মতান্তরে ৮ই মার্চ) এই ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগেই ঢাকায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। 'ঢাকাপ্রকাশ' ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র। তখনকার সময়ে পূর্ববাংলা থেকে কোনো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। যেগুলো পাওয়া যেত তা কলকাতা থেকে আসত। ব্রিটিশ শাসিত ভারত ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সাময়িকপত্রিকাগুলো প্রকাশতি হয়, তার মধ্যে 'আজাদ' পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালের ৩১শে অক্টোবর কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় 'আজাদ' পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। দেশভাগের পর পত্রিকার সমস্ত কার্যক্রম ঢাকায় স্থানান্তরিত করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবরে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন আবুল কালাম সামসুদ্দিন।

---

[৫] দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা সাময়িকপত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৯২।

[৬] https://bn.wikipedia.org/রিশর/ দৈনিক বসুমতী, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

[৭] মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১৮৪৭-১৯০০, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ২৭।

[৮] তদেব, পৃ. ৫৯।

১৯৪৯ সালে 'আজাদ' পত্রিকা পাকিস্তানের স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে (চিত্র-২)। এবং ধরে নেওয়া যায় স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তিতেও এই বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। পত্রিকাটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলার সপক্ষে কাজ করে এবং ৫২'র ভাষা আন্দোলনের ২১শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর ২২শে ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

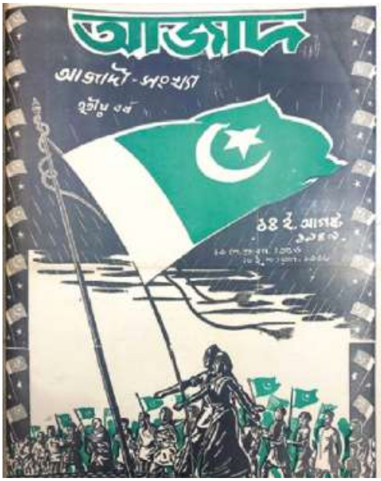

চিত্র-২
দৈনিক 'আজাদ', ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ

চিত্র-৩
দৈনিক 'আজাদ', ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত পত্রিকা

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত পত্রিকায় লিড নিউজ ছিল এরকম "ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত।" ভাষা আন্দোলনের এই মর্মান্তিক দিবসটিকে স্মরণ করার জন্য স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত তৎকালীন প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে ছোট করে একটি নিউজ ছাপা ছাড়া ১৯৬৭ সালের আগ পর্যন্ত আর কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। ১৯৬৭ সালে 'আজাদ' পত্রিকা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সাহসিকতার সাথে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে (চিত্র-৪)।

[৯] https://bn.wikipedia.org/wiki/দৈনিক আজাদ, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

দুই রঙে ছাপা ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে শিল্পী কালো লাইন ড্রইংয়ে ১৯৫২ সালের একুশের ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এবং লাল রঙের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত একুশকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে সংবাদ পত্রিকা ২১শে ফেব্রুয়ারি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য তুলে ধরে। প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় শামসুর রাহমানের 'গেরিলা' কবিতা এবং জহির রায়হানের 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ' প্রবন্ধ ছাপা হয় (চিত্র-৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তা ছিল জনগণের সময়ের দাবি। ষাটের দশকে ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার তৈরি করতে চাইলে তৎকালীন সরকার বাধা দেয় এবং ১৯৬৮ সালে বাংলার ছাত্রজনতা আবারও শহীদ মিনার তৈরির প্রচেষ্টা চালায় এবং পাকিস্তান সরকার তাতেও বাধা প্রদান করে। কিন্তু এবারে বাংলার জনগণ সরকারের বাধা অগ্রাহ্য করে সফলতার সাথে শহীদ মিনার তৈরি করে।

চিত্র-৪
১৯৬৭ সালে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ

চিত্র-৫
১৯৭২ সালে প্রকাশিত দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ

১৯৫১ সালের ১৭ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) খায়রুল কবিরের সম্পাদনায় এবং নাসিরউদ্দিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ‘সংবাদ’ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।[১০] ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল ২ আনা। ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার সম্পাদনায় ‘সাপ্তাহিক ইত্তেফাক’ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এবং ১৯৫৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। হাসান হাফিজুর রহমান ও শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারি ‘সাপ্তাহিক বাংলার বাণী’ প্রকাশ শুরু করেন এবং দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে দৈনিক ‘বাংলার বাণী’ নামে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে। ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকাটির পূর্ব নাম ছিল ‘দৈনিক পাকিস্তান’, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পরে ‘দৈনিক বাংলা’ নামে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলো স্বাধীনতা দিবসে কেমন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল তা নিম্নে দশক অনুযায়ী আলোচনা করা হলো।

চিত্র-৬
দৈনিক ‘আজাদ’ (১৯৭২)
শিল্পী : রণজিত নিয়োগী

চিত্র-৭
দৈনিক ‘ইত্তেফাক’ (১৯৭২)

[১০] https://bn.wikipedia.org/রিশর/দৈনিক সংবাদ, তারিখ : ১৬/০১/২০২১।

বিষয়-বিবরণ

১.১ ৭০-এর দশক

১৯৭২ সালে প্রথম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে স্বাধীন বাংলাদেশের সাময়িকপত্রগুলো বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকাটি ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ অলংকরণে সজ্জিত একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, বলিষ্ঠ লাইন ড্রইংয়ের প্রচ্ছদটির অলংকরণ করেন শিল্পী রণজিত নিয়োগী। শিল্পী তুলির টানে নারী-পুরুষের স্বাধীনতা লাভের অপার আনন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন। দুই রঙে অঙ্কিত প্রচ্ছদে কালো রঙে বিষয়বস্তু ও লাল রঙে নকশা অঙ্কন করেছেন (চিত্র-৬)। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের মধ্যে দুটি পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দিত; প্রথমটি দৈনিক 'আজাদ' ও দ্বিতীয়টি দৈনিক 'ইত্তেফাক'। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটিও দৃষ্টিনন্দন, তবে শিল্পীর নাম পাওয়া যায়নি (চিত্র-৭)। কালো রঙে পতাকার ফর্ম, লাল রঙে পতাকার মধ্যে বৃত্ত যা নতুন সূর্যের প্রতীক, পতাকার পিছনে লোকজ স্টাইলে গ্রামীণ পরিবেশ, পতাকার নিচে নারীপুরুষের আবক্ষ ড্রইং কালো রঙে, মাথার গামছা ও পরনের শাড়ি লাল রঙে। এবং কালো রঙে শিরোনাম দিয়ে অর্ধপৃষ্ঠার মধ্যে অলংকরণটি সম্পন্ন করছেন। দুই রঙে ছাপা ক্রোড়পত্রের অলংকরণটি নান্দনিক ও আকর্ষণীয়।

চিত্র-৮
দৈনিক 'আজাদ' (১৯৭৩)
শিল্পী : রণজিত নিয়োগী

চিত্র-৯
দৈনিক 'ইত্তেফাক'

১৯৭৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে চারটি সাময়িকপত্রের ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ চিত্র পাওয়া যায়। পত্রিকাগুলো হলো 'আজাদ', 'ইত্তেফাক', 'বাংলার বাণী', 'দৈনিক বাংলা' ও 'সংবাদ'। প্রত্যেকটি পত্রিকা স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে শিল্পীদেরকে দিয়ে প্রচ্ছদ আঁকিয়েছে এবং শিল্পীদের চিন্তা-ভাবনার বৈচিত্র্যের কারণে প্রচ্ছদগুলিও নানা রকমের ভাব প্রকাশ করেছে। 'আজাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে শিল্পী রণজিত নিয়োগী দুই রঙে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। তিনি পূর্ণ পৃষ্ঠাটিকে খাড়াভাবে তিনটি প্যানেলে ভাগ করে প্রথম প্যানেলে ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার, জনযুদ্ধ, স্বদেশ ও স্বাধীনতা শব্দগুলো লাল রঙের ব্লকের মধ্যে রিভার্স ও কালো রঙে আউট লাইন ও শেড দিয়ে লিখেছেন। প্রচ্ছদের মধ্যের প্যানেলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত জীবনের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশময় আধা বিমূর্ত ড্রইং, উপরের দিকে সূর্য এবং বাম পাশের প্যানেলের মধ্যে কয়েকটি লাল রঙের ব্লক করে রিভার্স ও কালো রঙের ড্রইং দিয়ে পূর্ণ পৃষ্ঠাটির ডিজাইন করেছেন (চিত্র-৮)। পাশাপশি 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে সাদাকালো ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে ডিজাইন করেছে। ফটোগ্রাফিতে এক বৃদ্ধের দেশাত্মবোধের বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠেছে। দুহাতে ছোটো পতাকাটি উঁচু করে ধরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লাল বৃত্তের মধ্যে থাকা মানচিত্রের দিকে, প্রকাশ পেয়েছে বুকের ভিতরের লুকানো ব্যথা, মনে মনে যেন বলছে এই মানচিত্রের জন্য কী ত্যাগ, কী কষ্টই-না করতে হয়েছে। অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে লাল রঙে বর্ডার ও ফ্রিহ্যান্ড ক্যালিগ্রাফি দিয়ে প্রচ্ছদপৃষ্ঠার ডিজাইন করে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। ফটোগ্রাফার ও প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম জানা যায়নি (চিত্র-৯)।

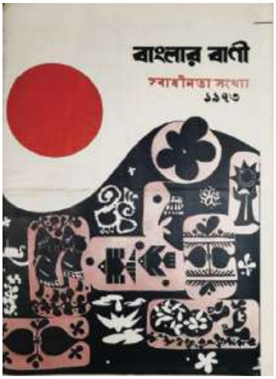

চিত্র-১০
দৈনিক 'বাংলার বাণী' (১৯৭৩)
শিল্পী : মো. ইদরিস

চিত্র-১১
'দৈনিক বাংলা' (১৯৭৩)

'বাংলার বাণী' ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে শিল্পী মো. ইদরিস বাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী, ফুল-পাতার ফর্মকে নিজের মতো করে রূপদান করে লোকজ ঢঙে উপস্থাপন করেছেন। দুই রঙের প্রচ্ছদে হালকা লাল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বিষয়বস্তু কালো, কখনো রিভার্সে অঙ্কন করে রাতের অন্ধকারকে পিছনে ফেলে বাংলার উপর ভোরের সূর্যোদয়ের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন (চিত্র-১০)। শিল্পীর অঙ্কনরীতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দিত। 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের পূর্ণপৃষ্ঠার প্রচ্ছদে ম্যাজেন্টা রঙের পটভূমির উপরে কন্ট্রাস্ট ফটোগ্রাফি দিয়ে ডিজাইন করেছে। বেওনেটযুক্ত রাইফেল কাঁধে এক মুক্তিযোদ্ধা হাত উঁচু করে যেন স্বাধীনতার কথা বলছেন। তাঁর হাতের আঙুল প্রচ্ছদের বলিষ্ঠভাবে লেখা শিরোনামকে স্পর্শ করেছে। শিল্পী এখানে মুক্তিযোদ্ধার মুখের ভাষাকে দৃশ্যায়িত করে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন (চিত্র-১১)। প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম উল্লেখ করেনি। 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অর্ধপৃষ্ঠার প্রচ্ছদে শিল্পী কালো ও হাফটোনের সলিড টোন ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অঙ্কন করেছেন এবং চিত্রে অভিব্যক্তি প্রকাশে জয়ের আনন্দের পাশাপাশি বিস্ময় ও ঘৃণা দুইই ফুটিয়ে তুলেছেন (চিত্র-১২)। প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। ১৯৭৪ সালে বেশকটি

চিত্র-১২
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৩)

চিত্র-১৩
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৭৪)
শিল্পী : হাশেম খান

আজাদ / স্বাধীনতা সংখ্যা / ২৬শে মার্চ / ১৯৭৪

আমরা যেদিন স্বাধীনতা দেখেছিলাম

চিত্র-১৪
দৈনিক 'আজাদ' (১৯৭৪)

বাংলার বাণী ● স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭৪

স্বাধীনতার কবিতা

চিত্র-১৫
দৈনিক 'বাংলার বাণী' (১৯৭৪)

সাময়িকপত্রের ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ পাওয়া যায়। যেমন– 'ইত্তেফাক', 'আজাদ', 'বাংলার বাণী', 'দৈনিক বাংলা', ও 'সংবাদ'। এই পাঁচটি প্রচ্ছদই ভিন্নমাত্রার ভালোলাগা তৈরি করেছে। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার পূর্ণ পৃষ্ঠার প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে শিল্পী হাশেম খানের "বাংলাদেশ '৫২-'৭১-'৭৩" সিরিজের একটি ড্রইং। ড্রইংয়ে কঙ্কালের মধ্য থেকে জীর্ণশীর্ণ একটি লোক দাঁড়িয়ে উপরে অপেক্ষমাণ শকুনগুলোর মুখপানের দিকে ম্লান মুখে চেয়ে আছে। শিল্পী কালি ও তুলির ওয়াশ ও স্কেচে চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যেন একাত্তরের বিভীষিকার চিত্র। 'আজাদ' পত্রিকা ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে শিল্পী ফটোগ্রাফিকে বিভিন্ন ফর্মে কেটে কম্পোজিশন করে ডিজাইন করেছেন। ফটোগ্রাফিগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অর্ধপৃষ্ঠার লাল-কালো প্রচ্ছদে শিল্পী শান্তির প্রতীক পায়রা, জাতীয় ফুল শাপলা, মুষ্টিবদ্ধ হাত ও পশ্চাতে ছেঁড়া কাঁটাতারের সমন্বয়ে কম্পোজিশন করে চমৎকারভাবে বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন। তদ্রূপ 'দৈনিক বাংলা'র অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে অঙ্কিত প্রচ্ছদে পায়রা ও শাপলার উপস্থিতি দেখা যায়, সাথে রয়েছে ফর্মে অঙ্কিত মুষ্টিবদ্ধ হাতে প্রতিবাদী কণ্ঠের আবক্ষ ড্রইং, পিছনে লাল সূর্যের পতাকা। লালকালো দুই রঙে অঙ্কিত প্রচ্ছদটি স্বাধীনতার কথাই বলে (চিত্র-১৬)। প্রচ্ছদে অঙ্কিত ফর্ম দেখে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কিত বলে মনে হয়।

'সংবাদ' পত্রিকা ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছে একটু আলাদা ঢঙে। পূর্ণপৃষ্ঠার প্রচ্ছদে কালো রঙের ফর্মে শিরোনাম, তার নিচে ফর্মে অঙ্কিত আবক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতে ফুল, নিচে মেঘের ফর্ম, সূর্যের ফর্ম ও গ্রামবাংলার প্রতীকী উপস্থাপন। বাম ও ডান পাশে ছোটো ছোটো পতাকার ফর্মের সমন্বয়ে অলংকরণ করেছেন (চিত্র-১৭)। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' ও 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ দুটির

চিত্র-১৬
'দৈনিক বাংলা' (১৯৭৪)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৭
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৪)

চিত্র-১৮
দৈনিক 'বাংলার বাণী' (১৯৭৫)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৯
'দৈনিক বাংলা' (১৯৭৫)

স্বাধীনতা দিবস'৭৬
দৈনিক বাংলা
জাতীয় চেতনা

চিত্র-২০
'দৈনিক বাংলা' (১৯৭৬)

স্বাধীনতা সংখ্যা
২৬শে মার্চ ১৯৭
দৈনিক ইত্তেফাক
চট্টগ্রামে যা ঘটেছিল
আধুনিক দেশ চাই

চিত্র-২১
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৭৬)
শিল্পী : হাশেম খান

ডিজাইনে মিল না থাকলেও আকাশি ও কালো রঙের মিল রয়েছে। 'বাংলার বাণী' ক্রোড়পত্রের অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে প্রচ্ছদের বিষয় হিসেবে রয়েছে গ্রামবাংলার প্রকৃতি, প্রতীকী ফর্মে অঙ্কন করলেও রয়েছে নান্দনিক উপস্থাপন। কালো রঙের গাছপালার মধ্যে রিভার্সে সূর্য, নীল রঙের হাফ টোনে পায়রা, দূরে হাফ টোনে গাছের ফর্ম ও দুটি ঘর, সব মিলিয়ে বাংলার অপরূপ দৃশ্যটি যেন রাতের জোছনায় শিল্পীর হাতে ধরা পড়েছে (চিত্র-১৮)। প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম নেই তবে এটি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কিত তা অনুধাবন করতে দেরি হয় না। তাঁর স্বকীয়তা প্রতিটি কর্মে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে নীল রঙের তিনটি প্যানেলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের তিনটি সাদাকালো ছবি দিয়ে অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে একটি সাদামাটা ডিজাইন করেছে (চিত্র-১৯)।

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের মধ্যে 'আজাদ', 'দৈনিক বাংলা', 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' এই চারটি পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'আজাদ' ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি সাদামাটা দায়সারাগোছের। এই সংখ্যায় পৃষ্ঠার উপরের দিকে ৮ কলাম ৪ ইঞ্চি মাপের একটি কালো জলরঙে ওয়াশ দিয়ে, পাতার ফর্ম এঁকে বিমূর্ত ডিজাইন করে তার উপরে লেখা রয়েছে– "আজাদী সংখ্যা"।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় ১৯৭৬ সালের পূর্বের সংখ্যাগুলোর প্রচ্ছদে শিরোনাম হিসেবে রয়েছে "আজাদ স্বাধীনতা সংখ্যা" কিন্তু ১৯৭৬ সাল থেকে পরবর্তী সব সংখ্যায় লেখা রয়েছে "আজাদী সংখ্যা" বা "আজাদী দিবস সংখ্যা"। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে শিল্পী হাশেম খান (যদিও শিল্পীর নাম প্রচ্ছদে উল্লেখ নেই) অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে তাঁর স্বকীয় ঢঙে গ্রামবাংলার দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। কালো রঙে অঙ্কিত ধান কেটে নিয়ে যাওয়া, নদীতে নৌকাবাইচ, কলসি নিয়ে কুলবধূ হেঁটে যাচ্ছে, মাছ ও ফুলের উপস্থিতি। আর সব কিছুই অঙ্কন করেছেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে। 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে বড়ো করে শিরোনাম দিয়েছে। তার পশ্চাতে মাকড়শার জালের পিছনে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট মুখের অবয়ব। ডিজাইনে পরাধীনতার একটি ভাব ফুটে উঠেছে অর্থাৎ কোথায় যেন একটা বাধা সম্মুখপানে হাজির হয়েছে, সেটিকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা (চিত্র-২২)। '৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ট্রাজেডির পরে স্বাধীন দেশে পরাধীনতার থাবায় দেশ ও জাতি নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তারই ধারাবাহিকতায় ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদগুলিও ক্রমান্বয়ে ম্লান হতে আরম্ভ করে ।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'আজাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি অপরিপক্ব হাতে অঙ্কিত অলংকরণ দিয়ে ডিজাইন হয়েছে বলে মনে হয় (চিত্র-২৩)। তিন রঙের ছাপা প্রচ্ছদে গ্রামবাংলার পাশাপাশি নদী-বন্দরের দৃশ্য উপস্থাপন করেছে। অঙ্কিত অলংকরণে তুলির টান, ফিগার ড্রইং, বন্দরের ক্রেনের ড্রইং সবমিলিয়ে শিল্পীর দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। 'দৈনিক বাংলা' স্বাধীনতা দিবস সংখ্যার প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে সাদাকালো ফটোগ্রাফি দিয়ে। ছবির বিষয় হিসেবে রয়েছে স্বাধীন দেশে উড্ডয়মান পতাকা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের উল্লসিত ছবি ও গ্রামবাংলার ছবি। অর্ধপৃষ্ঠাজুড়ে ছোটো-বড়ো সাইজের ফটোগ্রাফি দিয়ে কম্পোজিশন করে তিন পাশে মোটা বর্ডার দিয়ে ফ্রেমে বন্দি করেছে (চিত্র-২২)। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদের মধ্যে 'সংবাদ'-এর প্রচ্ছদটি দৃষ্টিনন্দিত। লাল সিঁদুর রঙের পটভূমির উপর কালো রঙের ফ্রিহ্যান্ড শুকনা ব্রাশে অঙ্কিত মুক্তিযোদ্ধাদের আবক্ষ ড্রইং (চিত্র-২৫) প্রচ্ছদ শিল্পী কাজী হাসান হাবীব। শিল্পীর ড্রইংয়ের মধ্যে যেমন ভবিষ্যতের ভাবনা ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনি বিজয়ের উল্লাসও প্রকাশ পেয়েছে। লাল পটভূমির মধ্যে রিভার্সে রয়েছে শিরোনাম।

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

সংবাদ ১৯৭৬

কী করে সে বেঁচে ছিলো

চিত্র-২২, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৬)

আজাদ

আজাদী দিবস সংখ্যা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুসলিম সংস্কৃতির অবদান

জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা

চিত্র-২৩, দৈনিক 'আজাদ' (১৯৭৭)

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

দৈনিক বাংলা

১৯৭৭

গণসংযোগ মাধ্যম ও জনসাধারণ

জাতীয়তাবোধ ইতিহাসের দৃষ্টিতে

চিত্র-২৪, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৭৭)

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

সংবাদ

চিত্র-২৫, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৭)
শিল্পী : কাজী হাসান হাবীব

আজাদী দিবস সংখ্যা '৭৮ আজাদ

ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ

চিত্র-২৬, দৈনিক 'আজাদ' (১৯৭৮)
শিল্পী : প্রাণেশ মণ্ডল

চিত্র-২৭, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৮)

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে প্রচ্ছদে দেখা যায় 'আজাদ' পত্রিকার অলংকরণে মাঝখানে পেন স্কেচ করে সূর্য, বাম পাশে কয়েকটি ফর্মে আঁকা পায়রা, ডান পাশে দুটি অর্ধ মুখমণ্ডল ও উদ্ধত হাতে রাইফেল ধরা। নিচে আট কলাম জুড়ে লেখা রয়েছে 'আজাদী দিবস সংখ্যা '৭৮ আজাদ' (চিত্র-২৬)। শিল্পী : প্রাণেশ মণ্ডল। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ছোটো-বড়ো ফটোগ্রাফির কম্পোজিশন করে। 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছে একটু অন্যভাবে সবুজ রঙের সরিষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দুজন মুক্তিযোদ্ধা খুব সতর্কতার সাথে কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে পটভূমি তৈরি করে তার উপরে রিভার্স চতুর্ভুজের মধ্যে একটি মুখাবয়ব সবুজ রঙে, তার মধ্যে নিচের দিকে অ্যালাইন করে কালো রঙে এভাবে আরো একটি এবং আরো একটি দিয়ে নিচে মেশিনগানে চোখ দিয়ে লক্ষ্য স্থির করা ফটোগ্রাফি কন্ট্রাস্ট করে কালো রঙে একটি, তারপর সবুজ রঙে দুটি, সবার সামনে বড়ো করে একটি কালো রঙে কন্ট্রাস্ট ফটোগ্রাফি দিয়ে ডিজাইন করেছে (চিত্র-২৭)। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ যেমন, 'আজাদ' পত্রিকায় সাদাকালো ছবিকে কন্ট্রাস্ট করে কালো রঙে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসের চিত্র। 'দৈনিক

বাংলা' ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ধরনের ছবি ছিঁড়ে কম্পোজিশন করেছে। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী রফিকুন নবী। অর্ধপৃষ্ঠার প্রচ্ছদটিতে শিল্পী আড়াআড়িভাবে তিনটি প্যানেলে ভাগ করেছেন। উপররের প্যানেলকে ছয়টি ভাগে ভাগ করে প্রথমে পতাকা, গেরিলার মুখমণ্ডল, মুক্তিযোদ্ধার মাথায় গামছা বাঁধা মুখমণ্ডল, মাথাল মাথায় কৃষক, একজন নারী এবং একটি ভাগে পাতার ড্রইং। অর্থাৎ সব পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। মধ্যের প্যানেলকে এভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রথমে ছোটো করে শিরোনাম তারপরে পাঁচটি প্যানেলে ফসলের আইকন, ফসল রাখার ঘর, রাইফেলের মাথায় সংযুক্ত বেওনেট, মুষ্টিবদ্ধ হাত ও লাঙল রয়েছে। নিচের প্যানেলে পত্রিকার নাম বড়ো করে লিখে শিল্পীর স্বকীয় স্টাইলে অলংকরণ করেছেন (চিত্র-২৮)। 'সংবাদ' পত্রিকার প্রচ্ছদে শিল্পী প্রথমে একটি মোটা লাল বর্ডার তারপর কালো বর্ডার এবং উপরের দিকে রিভার্সে পত্রিকার নাম। মাঝের অংশের উপরের দিকে লাল রঙে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭৯ টাইপের অক্ষরে বড়ো করে লেখা তার নিচে অর্ধবৃত্তাকার ফর্মের মধ্যে চাইল্ড ড্রইংয়ের মতো অঙ্কন করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে বোঝানোর চেষ্টা করেছে (চিত্র-২৯)। প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম নেই।

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭৯

ইত্তেফাক

চিত্র-২৮, দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৭৯)
শিল্পী : রফিকুন নবী

সংবাদ

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৭৯

চিত্র-২৯, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৭৯)

১.২ ৮০-এর দশক

১৯৮০ সালে কয়েকটি পত্রিকার ক্রোড়পত্র যেমন-'আজাদ', 'দৈনিক বাংলা', 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ'। 'আজাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংকরণ করেছেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম (হামিদ)। শিল্পী হামিদ আলংকারিক সূর্য, পায়রা ও তিনটি মুখমণ্ডল রিভার্সে অঙ্কন করে শিরোনাম লিখেছেন ফ্রিহ্যান্ড ক্যালিগ্রাফিতে ডান পাশে (চিত্র-৩০)।

'দৈনিক বাংলা'র অলংকরণ করেছেন শিল্পী লুৎফুল হক। শিল্পী বিমূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়কে কেন্দ্র করে অলংকরণ করেছেন (চিত্র-৩১)। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ শিল্পী আইনুল হকের ড্রইং দিয়ে ডিজাইন করেছেন। অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণকে দুটি ভাগে ভাগ করে বাম পাশে একটি ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে ডান পাশে ছোটো ছোটো কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ড্রইং করেছেন (চিত্র-৩০)। 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণটি একটু আলাদা। লাল পটভূমির উপরে কালো জলরঙের ওয়াশে বড়ো একটি মুখমণ্ডল। ড্রইংটি যেন স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর, তার সামনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিশোধের উত্তেজনায় সবাই নির্দেশনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে (চিত্র-৩১)। কাজী হাসান হাবীবের অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে এই অলংকরণ মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় রক্তিম দিনগুলোকে যেমন স্মরণ করিয়ে দেয় তেমনি তাজা রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা অর্জনের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

চিত্র-৩০, দৈনিক 'আজাদ' (১৯৮০)

চিত্র-৩১, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৮০)
শিল্পী : লুৎফুল হক

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা
দৈনিক ইত্তেফাক '৮০
২৬শে মার্চে স্বগতোক্তি
যেন ভুলে না যাই

চিত্র-৩২, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৮০)
শিল্পী : লুৎফুল হক

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা সংবাদ ১৯৮০
মার্চ মাস ও বাংলাদেশ

চিত্র-৩৩, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৮০)
শিল্পী : লুৎফুল হক

১৯৮১ সালের কয়েকটি পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংকরণ দেখা যায় ('দৈনিক বাংলা', 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ')। 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী রফিকুন নবী। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংকরণ করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ফটোগ্রাফি দিয়ে এবং 'সংবাদ' পত্রিকা ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি মাপের একটি ইলাস্ট্রেশন করে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছে। প্রচ্ছদে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। শিল্পী সলিড কালো রঙে দুজন মুক্তিযোদ্ধার আবক্ষ ড্রইং একটু ব্যতিক্রম স্টাইলে অঙ্কন করেছেন। দুজনেই মুক্তির আনন্দে উল্লসিত (চিত্র-৩৪)। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণে শিল্পী মাঝখানে সূর্যের মধ্যে ২৬শে মার্চ লিখে, সূর্যের আলোকরশ্মি তারপর বৃত্তকার বলয়ের চারপাশে গ্রামবাংলার দৃশ্য, শহর, ইন্ডাস্ট্রি, তারপরের বলয়ে মুক্তিকামী মানুষের আনন্দ বাউলের একতারায় ফুটে উঠেছে। কলসি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে কুলবধূ, একটি ছেলে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ দোতারা বাজাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়কে কালিকলমের ড্রইংয়ে চমৎকারভাবে স্বাধীন বাংলার দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন। শিল্পী এখানে যেমন সূর্যকে উপস্থাপন করেছেন আবার, পূর্ণিমার চাঁদকেও সন্নিবেশিত করেছেন (চিত্র-৩৫)। সব মিলিয়ে 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের সাদাকালো প্রচ্ছদ অলংকরণ সুন্দর ও ব্যতিক্রমী। **১৯৮২** সালের এই পাঁচটি পত্রিকার ক্রোড়পত্র পাওয়া যায়নি, নাকি পত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেনি তা স্পষ্ট নয়।

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা। সংবাদ

একটি দিন

আগুনের পরশমণি

বাঙালির স্বাধীনতা দিবস

চিত্র-৩৪, 'দৈনিক সংবাদ' (১৯৮১)

দৈনিক বাংলা

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

একটি অজানা অধ্যায়

কোন শহীদ বন্ধুর প্রতি

চিত্র-৩৫, 'দৈনিক বাংলা' (১৯৮১)
শিল্পী : রফিকুন নবী

১৯৮৩ সালে 'দৈনিক বাংলা', 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে দেখা যায় 'দৈনিক বাংলা'র ৪ কলাম ১০ ইঞ্চির অলংকরণের মাঝখানে সূর্যের প্রতীকের মধ্যে শিরোনাম। চারদিকে সূর্যরশ্মি ও নিচের দিকে উত্থিত কয়েকটি হাত যেন সূর্যকে ছোঁয়ার চেষ্টা। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের আট কলাম আট ইঞ্চি মাপের প্রচ্ছদ ডিজাইন করা হয়েছে শিল্পী হাশেম খানের একটি ড্রইং দিয়ে। শিল্পী লাল ও হালকা লাল রঙের কাগজের টুকরো পেস্ট করে তার উপর কলম দিয়ে ড্রইং করেছেন। বিমূর্ত এই ড্রইংয়ে বাংলার কৃষককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কৃষক এখানে মানববৃক্ষ হিসেবে রয়েছে–তার ছায়াতলে গ্রাম, শহর, উন্নয়ন ও সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণ কৃষকের ছায়াতলে থেকে নিজ নিজ কর্ম সাধন করে চলেছে (চিত্র-৩৬)। 'সংবাদ' পত্রিকার প্রচ্ছদটি বিমূর্ত অলঙ্করণ দিয়ে ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। ইতঃপূর্বে শিল্পী কামরুল হাসানের ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ দেখা যায়নি। ৪ কলাম ১০ ইঞ্চিকে দুইভাগে ভাগ করে উপরের অংশে শিরোনাম এই নিচের ৪ কলাম ৫ ইঞ্চিতে সলিড কালো রঙে নারী ও পুরুষের মুখোমুখি প্রোফাইল চিত্র এঁকে তার মধ্যে রিভার্স লাইন ড্রইংয়ে দুটি অবয়ব। তার মধ্যে রিভার্সে আরো কিছু আধা বিমূর্ত ফিগারের লাইন ড্রইং রয়েছে। ড্রইংগুলোতে নির্যাতন, কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কালো রঙের নারী ও পুরুষের প্রোফাইল অবয়বের পশ্চাতে লাল রং প্রয়োগ করে তার মধ্যে কালো রঙের লাইন ড্রইংয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতনের দৃশ্য অঙ্কন করে ১৯৮৩ সালের স্বাধীনতা দিবসে এসে শিল্পী '৭১কে স্মরণ করেছেন তাঁর অনুভূতি দিয়ে (চিত্র-৩৭)।

চিত্র-৩৬, দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৮৩)
শিল্পী : হাশেম খান

চিত্র-৩৭, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৩)
শিল্পী : কামরুল হাসান

১৯৮৪ সালে নজরকাড়া ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ দেখা যায় না। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটির মাপ ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি। কালো রঙে বিষয়বস্তু অঙ্কন করে কোথাও কোথাও লাল রং প্রয়োগ করেছে। যেমন– পতাকার বৃত্ত লাল, একজন যোদ্ধার পরনের কাপড় লাল, শিরোনাম লাল। অলংকরণের বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে পতাকা বাঁধা রাইফেল হাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধার দুর্বল ড্রইং। 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের উপরের দিকে ৮ কলাম ৩ ইঞ্চির মধ্যে দায়সারা গোছের আধাবিমূর্ত একটি ড্রইং ও ডান পাশে রিভার্সে শিরোনাম দিয়ে অলংকরণ করেছে। তদ্রূপ 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংরণে দেখা যায় শিল্পী লুৎফুল হক বিমূর্ত ড্রইংয়ে এমনভাবে একটি গ্রামীণ দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন যেন দেখলে মনে হয় একটি ঝোপের ভিতর দিয়ে সূর্য উঠছে। এই ঝোপের ড্রইং খেয়াল করলে দেখা যায় ডান হাতে ফুলের গোছা ও বাম হাতে রাইফেল

ধরা। শিল্পী ফ্রিহ্যান্ড তুলির লাইন ড্রইংয়ে বিষয়বস্তু অঙ্কন করেছেন। কালো রঙে অঙ্কন করা অলংকরণের বাম পাশে স্বাধীনতা দিবস লেখা, ডান পাশে পত্রিকার নাম ও সাল উল্লেখ করে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন।

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৮৫
সংবাদ
২৫শে মার্চ ১৯৭১

চিত্র-৩৮
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৫)
শিল্পী: কাজী হাসান হাবীব

দৈনিক ইত্তেফাক
আমার দেশ
স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

চিত্র-৩৯
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৮৫)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

১৯৮৫ সালের 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্র অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাজী হাসান হাবীব। ৪ কলাম ২০ ইঞ্চি মাপের প্রচ্ছদ অলংকরণে শিল্পী লাল পটভূমিকে দুইভাগে ভাগ করে উপরের ছোটো অংশে শিরোনাম ছোটো করে এবং পত্রিকার নাম রিভার্স চিকন লাইনে বড়ো করে। তার নিচে কালো সলিড ব্যান্ড, তার নিচে আধা বিমূর্ত ধাঁচে প্রোফাইল মুখ এঁকে মাথার উপরে বেওনেটযুক্ত রাইফেলের সাথে পতাকা বাঁধা, ব্যাকগ্রাউন্ডে আড়াআড়িভাবে কয়েকটি চিকন লাইন রিভার্স ও কালো রঙে এবং নিচের দিকে একটি মোটা সলিড ব্যান্ড দিয়ে প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছে (চিত্র-৩৮)। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। কালিকলমে অঙ্কিত অর্ধপৃষ্ঠার অলঙ্করণে শিল্পী গ্রামীণ পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন কিছুটা স্যুররিয়েলিজম ধারায়। গ্রামীণ পরিবেশে কয়েকজন নারীপুরুষ পতাকা হাতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। প্রচ্ছদ শিরোনাম ও পত্রিকার নাম শিল্পীর স্বকীয় স্টাইলে লেখা (চিত্র-৩৯)। ১৯৮৫ সালের 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের

উপরের অংশে ছোটো করে ৮ কলাম জুড়ে কালো রঙের গ্রেড ব্যবহার করে তিনটি স্টেপ দিয়ে মাঝখানে কালিকলমে ড্রইং করে জলরঙে ওয়াশ দিয়ে ইলাস্ট্রেশন করেছেন। আবক্ষ ইলাট্রেশনের বিষয় হিসেবে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের আনন্দ। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছে অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে এবং একটু অন্য রকম স্টাইলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের যে গতি, জনগণের মধ্যে যে উত্তেজনা সেটিকে শিল্পী তীর্যক লাইন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বৃত্তাকার লাইন ব্যবহারের পাশাপাশি কিছু ক্যারেক্টার লাইন প্রয়োগ করে অঙ্কন করেছেন। পিছনের নির্দেশিত হাত ও মুখমণ্ডলের ড্রইং করেছেন গতিশীল লাইন প্রয়োগ করে তার পিছনে ডান পাশে ছোটো লাল বৃত্ত দিয়ে সূর্যকে বুঝিয়েছেন, এরপর আরেকটি বৃত্ত বলয় তার উপরে উড়ন্ত পায়রা নিচে ছোটো করে পতাকা হাতে একদল সংগ্রামী জনতা বিজয় উল্লাস করছে (চিত্র-৪০)। ডান দিকে নিচে শিরোনাম লাল রঙে দিয়ে বাম, ডান ও উপরের দিকে কালো, লাল ও কালো রঙের গ্রেড ব্যবহার করে তিনটি মোটা লাইন দিয়ে কিছুটা ফ্রেমের মতো করে প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে। দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি বেশ আকর্ষণীয়।

বাংলার বাণী
বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার
মুজিবনগর সরকার: কিছু স্মৃতি

চিত্র-৪০
দৈনিক 'বাংলার বাণী' (১৯৮৫)

স্বাধীনতা ও
জাতীয় দিবস'৮৬
আজাদ
স্বাধীনতা

চিত্র-৪১
দৈনিক 'আজাদ' (১৯৮৬)
শিল্পী : হামিদুল ইসলাম

১৯৮৫ সালে 'আজাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্র পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ একই ধরনের, শুধু

শিরোনামে সাল পরিবর্তন করেছে। উপরের দিকে আটকলাম চার ইঞ্চি মাপের অলংকরণে শিল্পী মো. হামিদুল ইসলাম (হামিদ) কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার আবক্ষ লাইন ড্রইং, হাতে রাইফেল, মেশিনগান উঁচু করে বিজয়ের বেশে ফিরে আসছে পিছনে সূর্য, উড়ন্ত পায়রা যা শান্তির প্রতীক হিসেবে অঙ্কন করেছেন। সাদামাটা অলংকরণটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কেই ঈঙ্গিত করে।

১৯৮৬ সালে 'বাংলার বাণী' ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ ডিজাইনে বাম পাশে স্মৃতিসৌধ ও ডান পাশে অপরাজেয় বাংলার ফটোগ্রাফি দিয়ে মাঝখানে পত্রিকার নাম, তার নিচে আলপনা, তারপর শিরোনাম তার নিচে আলপনা দিয়ে ডিজাইন করেছে। 'দৈনিক বাংলা'র ক্রোড়পত্রের অলংকরণ ৮ কলাম ৪ ইঞ্চি মাপের মধ্যে গ্রামীণ পরিবেশে একদল সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা, পতাকা, রাইফেল হাতে বিজয় উল্লাস করতে করেতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে এরকম একটি লাইন ড্রইং ও ডান পাশে শিরোনাম দিয়ে ডিজাইন করেছে। ইলাস্ট্রেশনটির মান ভালো হলেও ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি একটু ম্যাড়মেড়েভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংকরণ করেছেন শিল্পী হাশেম খান। পাঁচ কলাম দশ ইঞ্চি মাপের অলংকরণে শিল্পী ক্যারিকেচার বা কাটাকুটি ঢঙে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৬ সালের স্বাধীনতা দিবসকে শিল্পী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ছোটো বড়ো করে ফাঁকে ফাঁকে লিখে পাশে পেন ড্রইংয়ে জনতার মিছিল, ফুল '৭১-এর স্মরণার্থীর ঢল এঁকে সলিড কালো রঙের ব্রাশ দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে জায়গায় জায়গায় মুছে দিয়েছেন এবং এই সলিড রংকে ব্যালেন্স করার জন্য কলম দিয়ে আড়াআড়িভাবে ছোটো-বড়ো লাইন দিয়ে উপরের দিকে শিল্পীর নিজস্ব স্টাইলে শিরোনাম দিয়ে প্রচ্ছদচিত্র অলংকরণ করেছেন। 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অংকরণ করেছেন শিল্পী বীরেন সোম। শিল্পী কালিকলমের স্কেচে বিমূর্ত বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অলংকরণের বিষয় হিসেবে রয়েছে সূর্য, পায়রা, রাইফেল পিছনে গ্রামবাংলা। সামনে নিচের দিকে এক সারি আধা-বিমূর্ত মুখবয়ব, উপরে বাম দিকে শিরোনাম। ৮ কলাম ৮ ইঞ্চি মাপের মধ্যে আধা-বিমূর্ত স্টাইলে অঙ্কিত অলংকরণটিতে ত্যাগ ও প্রাপ্তি দুই প্রকাশ পেয়েছে (চিত্র-৪২)।

চিত্র-৪২
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৬)
শিল্পী : বীরেন সোম

চিত্র-৪৩
'দৈনিক বাংলা' (১৯৮৭)
শিল্পী : রফিকুন নবী

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে তেমন কোনো সৃজনশীলতা দেখা যায় না। 'বাংলার বাণী' ক্রোড়পত্রের ডিজাইন করেছে দুটি ফটোগ্রাফি দিয়ে। 'দৈনিক বাংলা' ডাবলস্প্রেড পৃষ্ঠাজুড়ে উপরের দিকে ৮ কলাম ৪ ইঞ্চি মাপের মধ্যে উড়ন্ত পায়রার ফর্ম দিয়ে অলংকরণ করেছে। স্প্রেগান ব্যবহার করে পটভূমি তৈরি করে তার মধ্যে রিভার্সে কয়েকটি স্টেপ দিয়ে তার উপরে রিভার্সে পায়রা, দূরে মাঠে কৃষক হাতে ধান ও একজন ধানের আঁটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন ডিজাইন করেছে। 'ইত্তেফাক 'পত্রিকার অলংকরণ করেছেন শিল্পী হাশেম খান। রিভার্সে শিরোনাম লিখে উপরে ও নিচে সলিড পাহাড়ের মতো বক্র ফর্ম, তারমধ্যে কিছুটা খাড়া, বাঁকা লাইন দিয়ে ৪ কলাম ৫ ইঞ্চি মাপের অলঙ্করণ করে ডিজাইন করেছেন। ১৯৮৭ সালে উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ অলংকরণ দেখা যায় 'সংবাদ' পত্রিকায়। দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় বিষয়বস্তু লাল রঙে ও শিরোনাম ও প্রবন্ধ কালো রঙে (চিত্র-৪৩)। প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী রফিকুন নবী। আধা-বিমূর্ত ধাচের অলংকরণে শিল্পী পৃষ্ঠার মাঝখানে একটি বৃক্ষের স্কেচ করে উপরের পাতার অংশের মধ্যে এক মায়ের ক্রন্দনরত প্রোফাইল ড্রইং, সামনে পাঁচটি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ছেলের মুখাবয়বের ড্রইং, বামপাশের উপরের দিকে গ্রামবাংলার দৃশ্য, ডান পাশের নিচের দিকে নৌকা,

পতাকা, ঘরবাড়ি। বৃক্ষে কয়েকটি বাবুই পাখির বাসা ঝুলছে (যদিও বাবুই পাখির বাসা তালগাছ বা নারকেল গাছ ছাড়া দেখা যায় না)। বৃক্ষের পাশে পাখি উড়ছে, বৃক্ষের গোড়ার দিকে একটি হাতের উপর একটি পাখি। সব মিলিয়ে এই প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে।

চিত্র-৪৪, দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৮)
শিল্পী : কাজী হাসান হাবিব

চিত্র-৪৫
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৮৯)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

১৯৮৮ সালে 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন কাজী হাসান হাবীব। ইংরেজি 'T' বর্ণের আদলে ম্যাজেন্টা পটভূমির মধ্যে কলো রঙে এক্সপ্রেশনিস্ট ধাঁচে তুলির আঁচড়ে মানুষের মুখাবয়ব ও ফিগার অঙ্কন করেছেন। ড্রইংয়ের অভিব্যক্তিতে হায়েনাদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা, কখনো প্রতিবাদ আবার কোনোটিতে বিমর্ষ ভঙ্গিতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সব মিলিয়ে ড্রইংয়ে একটি আদিমতা ও অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে (চিত্র-৪৪)। দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একই দিনে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে কাঁচা হাতে অঙ্কিত বাংলার প্রকৃতি। পৃষ্ঠার উপরের দিকে আট কলাম চার ইঞ্চি মাপের স্কেচের মাঝখানে উপরের দিকে লাল রঙের কাগজের ছেঁড়া অর্ধবৃত্তকার ফর্মের মধ্যে রিভার্সে শিরোনাম দিয়ে ডিজাইন করেছে। ১৯৮৮ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী হাশেম খান। চিত্রটি দেখলে মনে হয় অঙ্কিত চিত্রের উপর মোটা ড্রাই ব্রাশ দিয়ে বিক্ষিপ্ত টান দিয়ে চিত্রটি নষ্ট করে

দেয়ার মতো করে বিমূর্ত ধাঁচে অঙ্কন করেছেন। শিল্পী হয়তো এ সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে এমনটি করেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন শিল্পীর নিজস্ব স্টাইলে উপরের দিকে। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ বলে মনে হয় না বরং একটি গল্পের ইলাস্ট্রেশন বলে মনে হয়।

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণের মধ্যে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয় ও অর্থবহ। অর্ধপৃষ্ঠার প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। অলংকরণের বিষয়বস্তু অঙ্কনে দেখা যায় লাইন ড্রইংয়ের মধ্যে প্যাস্টেল রং দিয়ে চিত্রিত করেছেন। শিরোনাম ডান পাশে উপরের দিকে শিল্পী নিজস্ব স্টাইলে লিখে ডিজাইন করেছেন (চিত্র-৪৫)। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ পৃষ্ঠার উপরের দিকে ৮ কলাম ৫ ইঞ্চি মাপের মধ্যে দুই রঙে কালো পটভূমির মধ্যে লাল রঙের উদীয়মান সূর্যের সামনে দুর্বল ড্রইংয়ে রিভার্সে পায়রা। পায়রার ডানা দুটি মনে হয় আলাদা লাগানো। বাম পাশে লাল রঙে কয়েকটি ফুল ও রিভার্সে পাতা। পশ্চাতে একটি শিকল, ডান দিকে উপরে লাল ও রিভার্সে শিরোনাম দিয়ে ডিজাইন করা। ক্রোড়পত্রের অলংকরণ হলেও প্রচ্ছদ অলংকরণ হিসেবে সৃজনশীলতার অভাব রয়েছে। তদ্রূপ 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণও প্রচ্ছদ ডিজাইন হিসেবে আকর্ষণীয় নয়। ১৯৮৯ সালে সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি মাপের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী আবদুল বাসেত। ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ আঁকিয়ে হিসেবে শিল্পী আবদুল বাসেতের দেখা এই প্রথম। দুই রঙে অঙ্কিত অলংকরণে শিল্পী মা-মেয়েকে অঙ্কন করেছেন বিমর্ষভাবে। মেয়েকে ধরে মা উপরের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন অসহায় ভঙ্গিতে আর মেয়ে মায়ের হাঁটুতে মাথা রেখে তার উপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার আলবদরদের নারকীয় তাণ্ডবের শিকার বাংলার মায়েরা মেয়েরা তারই প্রতীকী উপস্থাপন এই অলংকরণে (চিত্র-৪৬)।

১.৩ ৯০-এর দশক

১৯৯০ সালেও শিল্পী আবদুল বাসেত সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের অলংকরণ করেছেন। এখানেও শিল্পী দুই নারীকে উপস্থাপন করেছেন জলরঙের ওয়াশে। ভাঙা কুঁড়েঘরের মধ্যে একজন হাতের উপর মাথা দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে, অন্যজন সামনে উপর হাঁটুতে বসে দুহাত দুগালে দিয়ে ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবছেন কিংবা অতীত

স্মৃতিচারণ করছে (চিত্র-৪৭)। অসহায় এই মানুষগুলো দেশের জন্য কী ত্যাগই না করেছে। শিল্পীর তুলিতে এমনটাই প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৯০ সালে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণের মধ্যে 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি মাপের অলংকরণে মোটা লাইন ড্রইংয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার এক হাতে রাইফেল উঁচু করে ধরা, অন্য হাতে পাতাকা বাম কাঁধের উপর ঠেস দিয়ে ধরা। পিছনে লাল সূর্য এঁকে ফিগারের মধ্যে হালকা লাল ও হালকা কালো রঙে প্রচ্ছদ এঁকেছেন। আবক্ষ ড্রইংটি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে উপস্থাপন করলেও প্রচ্ছদ হিসেবে ততটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। একইভাবে মোটা লাইন ড্রইংয়ে অঙ্কিত দৈনিক বাংলা পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদও আকর্ষণীয় নয়। ইত্তেফাক পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী হাশেম খান। তাঁর নিজস্ব স্টাইলে শিরোনাম লিখে তার নিচে সলিড গাঢ় কমলা রঙের মধ্যে কালো রঙে বাঙালির উপর পাকহানাদার বাহিনীর বেয়নেটযুক্ত রাইফেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, বাঙালিকে নির্মমভাবে অত্যাচার করার চিত্র অঙ্কন করেছেন (চিত্র-৪৮)।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদগুলোর তেমন সাড়াজাগানো অলংকরণ দেখা যায় না। 'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নানা রকমের ফটোগ্রাফি দিয়ে, 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ জুড়ে রয়েছে ফুলের ড্রইং। উপরের অর্ধপৃষ্ঠায় কালো রঙে মোটা লাইন ড্রইংয়ে ফুল পাতার

চিত্র-৪৬
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৯),
শিল্পী : আবদুল বাসেত

চিত্র-৪৭
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯০)
শিল্পী : আবদুল বাসেত

কম্পোজিশান করে লাল, লাল-কালোর গ্রেড ব্যবহার করে উপরের দিকে শিরোনাম দিয়ে অলংকৃত করেছে (চিত্র-৪৯)। ১৯৯১ সালে 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শিল্পী চন্দ্রশেখর দে। খাড়াভাবে অর্ধপৃষ্ঠাজুড়ে প্রচ্ছদচিত্রে শিল্পী প্যাস্টেল রঙে বিমূর্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিষয় হিসেবে রয়েছে সকালের সূর্যোদয়, বিমূর্ত মুখাবয়ব, নিচে পানি, পানিতে রক্ত পড়ছে, প্রবাহিত হচ্ছে স্রোতধারা। দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি '৯১ সালে প্রকাশিত প্রচ্ছদগুলোর মধ্যে আলাদা, এবং শিল্পী চন্দ্রশেখর দে'র ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণও প্রথম দেখা যায় (চিত্র-৫০)। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে দেখা যায় 'বাংলার বাণী' পত্রিকার অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণ করেছে শিল্পী জোয়ারদার। সবুজ রঙের পটভূমির মধ্যে দুর্বল তুলির টানে বিজয়বেশে মুক্তিযোদ্ধাদের শহরে ফিরে আসার দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। ড্রইং ও শহরের দৃশ্য অঙ্কনে শিল্পী পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। তিন রঙে ছাপা প্রচ্ছদটিতে নান্দনিকতার অভাব রয়েছে (চিত্র-৫১)। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে অপরাজেয় বাংলার ফটোগ্রাফি দিয়ে। কমলা রঙের পটভূমির ওপর উপরের দিক থেকে ছোটো থেকে ক্রমান্বয়ে বড়ো

দৈনিক ইত্তেফাক
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২৬শে মার্চ ১৯৯০
ইতিহাস

চিত্র-৪৮
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৮৯),
শিল্পী : আবদুল বাসেত

স্বাধীনতা দিবস
দৈনিক বাংলা বিশেষ সংখ্যা ১৯৯১
সেইসব মুখ

চিত্র-৪৯
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯০)
শিল্পী : আবদুল বাসেত

চিত্র-৫০
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯১)
শিল্পী : চন্দ্রশেখর দে

চিত্র-৫১
দৈনিক 'বাংলার বাণী' (১৯৯২)
শিল্পী : জোয়ারদার

রিভার্স স্টেপ বা লাইন, তার উপর কনট্রাস্ট ফটোগ্রাফি কালো রং দিয়ে ডিজাইন করেছে। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী হাশেম খান। প্যাস্টেল রঙে অঙ্কিত বিমূর্ত চিত্রের বিষয় হিসেবে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ (চিত্র-৫২)। সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী আবদুল বাসেত। অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণে শিল্পী কালার পেন্সিল ব্যবহার করে ফ্রিহ্যান্ড ড্রইংয়ে বিষয়বস্তু অঙ্কন করেছেন। বিষয় হিসেবে রয়েছে পরিবার, বাবার অনুপস্থিতিতে মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ছেলে পিছন দিক দিয়ে মায়ের কাধে মাথা দিয়ে মলিন মুখে তাকিয়ে আছে (চিত্র-৫৩)। চিত্রের ডান পাশে নিচের দিকে একটি কবিতার চরণ ব্যবহার করেছে। ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে এই প্রথম কবিতার ব্যবহার দেখা যায়।

১৯৯৩ সালে 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে দুর্বল হাতের ড্রইংয়ের সাথে ফটোগ্রাফি দিয়ে। আট কলাম পাঁচ ইঞ্চি মাপের অলঙ্করণটি লাল, সবুজ ও কালো এই তিন রঙে ছাপা। দৈনিক বাংলা পত্রিকার প্রচ্ছদ দুই রঙে ছাপা। উপরের দিকে চার কলাম দশ ইঞ্চি মাপের প্রচ্ছদ অলংকরণটি কমলা রঙের একটি পটভূমি তৈরি করে তার উপর বিজয় মিছিলের একটি ফটোগ্রাফি কনট্রাস্ট করে কালো রঙে ছাপা। 'সংবাদ' পত্রিকা ঈদ ও স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

চিত্র-৫২
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৯২)
শিল্পী : হাশেম খান

চিত্র-৫৩
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯২)
শিল্পী : আবদুল বাসেত

শিল্পী লাল ও কালো জলরঙের তুলির টানে লোকজ স্টাইলে আকাশে তারা, নদীতে নৌকা, শাপলা ও মাছ নিচের দিকে পল্লি গাঁয়ের নারীপুরুষের আবক্ষ ড্রইং অঙ্কন করেছেন (চিত্র-৫৪)। শিল্পী স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে ঈদ উদ্‌যাপনে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসকে তুলে ধরেছেন।

১৯৯৪ সালে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছে জলরঙের ওয়াশ দিয়ে শিল্পী আবুল বারক আলভী। দুই রঙে ছাপা অলংকরণের বিষয় হিসেবে রয়েছে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল ও পতাকা হাতে বিজয়ের দৃঢ়তা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে নদী, নৌকা গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি। ডান পাশে উপরে দিকে শিরোনাম দিয়ে প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছে (চিত্র-৫৫)। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ অত্যন্ত দুর্বল। কালো ও সবুজ এই দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি দৃষ্টিনন্দিত নয়। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি একটু আলাদা স্টাইলে অঙ্কন করা। অলংকরণ শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। লাল ও কালো রঙের পাশাপাশি লাল ও কালো রঙের হালকা শেড ব্যবহার করে রিভার্স লাইন দিয়ে

বিজয়ের বেশে মুক্তিযোদ্ধাদের ফিরে আসার দৃশ্য তুলে ধরেছেন (চিত্র-৫৬)।

সংবাদ
ইতিহাসের বিকৃতি
আসুন ইতিহাস পাঠ করি
মরীচিকাও যে নেই

চিত্র-৫৪
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯৩)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

দৈনিক
ইত্তেফাক

চিত্র-৫৫
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৯৪)
শিল্পী : আবুল বারক আলভী

১৯৯৪ সালে শিল্পী আবদুল বাসেত অঙ্কন করেন সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রে প্রচ্ছদ। শিল্পী এবার ব্রাউন পেপারের উপর পেন্সিলে ড্রইং করেছেন। বিষয় হিসেবে রয়েছে দুই নারী ও শিশু। উভয় নারী এঁকে অপরের সাথে কথোপকথন ও একজন অন্যজনের হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়ার যে ড্রইং অঙ্কন করেছেন তাতে মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীদের যে অবদান, সেই অবদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দুই রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে (চিত্র-৫৭)। ক্রোড়পত্রের অঙ্গসজ্জা করেছেন শিল্পী বীরেন সোম।

১৯৯৫ সালে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার চার রঙে ছাপা ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণের বিষয় হিসেবে রয়েছে বিজয় মিছিল। শিল্পী অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতায় স্বাধীনতার যে আনন্দ সেটি ফুটিয়ে তুলেছেন (চিত্র-৫৮)। সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। শিল্পী একতারা হাতে বাউল, পিছনে তার সঙ্গী দুজনে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলার

স্বাধীনতা দিবস
দৈনিক বাংলা
বিশেষ সংখ্যা
১৯৯৪
ছাব্বিশে মার্চের ভাবনা
আমাদের জাতীয়তার বোধ
ছাব্বিশে মার্চ
মার্চ উনিশ শ একাত্তর

চিত্র-৫৬
'দৈনিক বাংলা' (১৯৯৪)

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৯৪ ॥ সংবাদ
মুক্তিযোদ্ধার
কবির দেশ
স্বাধীনতার

চিত্র-৫৭
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯৪)
শিল্পী : কাজী আবদুল বাসেত

দৃশ্য অঙ্কন করছেন। বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে যেন বাউল তার গানে গানে প্রকাশ করছে। উপরে ডানদিকে সূর্যের সামনে পায়রা আনন্দে উড়ছে। অর্ধপৃষ্ঠায় জুড়ে শিল্পীর নিজস্ব স্টাইলে পেন স্কেচ করেছেন এবং ম্যানুয়েল কালার সেপারেশনের মাধ্যমে লাল ও কালো এই দুই রঙে ছাপা। পৃষ্ঠার উপরের দিকে ৮ কলাম ৫ ইঞ্চি মাপের অলংকরণের প্রচ্ছদ ডিজাইনটি '৭১ সালের উত্তাল সময়কে অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

১৯৯৬ সালে 'বাংলার বাণী' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ দুই রঙে ছাপা। দুর্বল ড্রইং ও ফটোগ্রাফির উপর দুর্বল হাতে রিটাস করে অর্ধপৃষ্ঠাজুড়ে কম্পোজিশন করলেও প্রচ্ছদটি দৃষ্টি নন্দিত নয়। ১৯৯৬ সালের দুটি আকর্ষণীয় ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ হচ্ছে 'দৈনিক বাংলা' ও 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই, 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন শিল্পী মামুন কায়সার। দৈনিক বাংলার প্রচ্ছদে শিল্পী জলরঙে বাংলার একদল সংগ্রামী মুক্তিকামী মানুষের যুদ্ধ করতে করতে সকল বাধা ভেঙে বিজয়ের বেশে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে এমনই একটি দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। পিছনে বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে

লাল সূর্য উদীয়মান তার সামনে দুটি শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ে যাচ্ছে (চিত্র-৫৯)। তদ্রূপ 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণ করছেন শিল্পী মামুন কায়সার। শিল্পী কিছুটা গ্রাফিক্যাল ঢঙে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। অর্ধপৃষ্ঠার অলংকরণের বিষয় হিসেবে রয়েছে লাল সূর্য, উড়ন্ত পায়রার হলুদ ফর্মের পটভূমি মধ্যে সূর্যের আলোক রশ্মি তারপরে একসারি বিভিন্ন রঙের ফুল সূর্যকে ঘিরে রয়েছে। ডান দিকে পায়রার পিছনে সবুজ রঙের মধ্যে ১৯৭১ ও ১৯৯৬ সাল দুটি মোটা তুলিতে লেখা, বাম দিকে পায়রার গলার উপর কতগুলো মুখমণ্ডল লাইন ড্রইং, পায়রার পাখনার উপর লাল, সবুজ, কালো ও রিভার্সে শিরোনাম দিয়ে কম্পোজিশন করেছেন। আকর্ষণীয় ও কালারফুল প্রচ্ছদটি বিগত প্রচ্ছদ থেকে একটু আলাদা যা শিল্পীর নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করে (চিত্র-৬০)।

স্বাধীনতা দিবস
দৈনিক বাংলা
বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৫
জনক

চিত্র-৫৮
'দৈনিক বাংলা' (১৯৯৫)

স্বাধীনতা দিবস
প্রকৃতি ও প্রবণতা

চিত্র-৫৯
'দৈনিক বাংলা' (১৯৯৬)

১৯৯৬ সালের সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর। স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি ম্যাজেন্টা রঙের মধ্যে কালো রঙে আধা-বিমূর্তভাবে বিষয়বস্তু অঙ্কন করেছেন। বিষয় হিসেবে রয়েছে উড়ন্ত পায়রা, পতাকা, তার নিচে কাঁটাতারের প্যাঁচানো দুটি গোলাকার ফর্মের মধ্যে এক পাশে একটি শাপলা অন্য পাশে একটি মৃত পায়রা। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে

এসেও আমরা যেন বন্দি, নিচে একটি লাশবাহী জনতার মিছিল (চিত্র-৬১)।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী
দৈনিক ইত্তেফাক
মৃত্যুগুহায় ছ'দিন
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গ
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও পঁচিশ বছরের সাহিত্য

চিত্র-৬০
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৯৬)
শিল্পী : মামুন কায়সার

আন্দোলন
সংবাদ
স্বাধীনতার ২৫ বছর
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

চিত্র-৬১
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯৬)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত সংবাদ পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। দুই রঙে ড্রাই ব্রাশের টানে বিমূর্তভাবে বাংলার প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে নারীপুরুষ পতাকা হাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। বিমূর্ত ধাঁচের এ প্রচ্ছদটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় (চিত্র-৬২)। ১৯৯৮ সালের প্রচ্ছদ আরো বেশি বিমূর্ত। লাল রঙের ড্রাই ব্রাশে সূর্য এঁকে মোটা ড্রাই ব্রাশে সূর্যরশ্মি বোঝাতে বিক্ষিপ্ত টান দিয়ে তার উপরে কালো রঙের তুলিতে ও কালিকলমে পতাকা, মেঘ, ইন্ডাস্ট্রি, উন্নয়নের চাকা, শহর-গ্রাম রেল লাইন সামনে নারী-পুরুষের আবক্ষ ড্রইং সবার সামনে একটি হাত শান্তির প্রতীক পায়রা উন্মুক্ত আকাশে ছেড়ে দেওয়ার ড্রইং দিয়ে অর্ধপৃষ্ঠাজুড়ে কম্পোজিশন করেছেন (চিত্র-৬৩) 'ইত্তেফাক' পত্রিকার অলংকরণে শিল্পীর নাম নেই। শিল্পী পূর্ণ পৃষ্ঠার চার পাশে লাল সবুজের পতাকা, বাংলার উন্নয়ন দেশাত্মবোধের প্রতীকী উপস্থাপনের ড্রইং করে তার উপর বিভিন্ন রঙে এয়ার ব্রাশ দিয়ে স্প্রে করে অলংকরণ করেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন বাম দিকে উপরে।

১৯৯৯ সালে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী বীরেন সোম। শিল্পী মিশ্র রঙে বাংলার প্রকৃতির মাঝে একজন নারী ও দুইজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা বিজয়ের ইঙ্গিত দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। শিল্পী কিছুটা কাইয়ুম চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত। মেঘ, পাখি, ফিগার ড্রইংয়ের স্টাইল (বিশেষ করে মহিলা) ও রং প্রয়োগের ধরন দেখে তাই মনে হয়। রঙিন প্রচ্ছদটি বেশ আকর্ষণীয় (চিত্র-৬৪)। শিরোনাম উপরের দিকে বাম পাশে। ১৯৯৯ সালে শিল্পী আবুল বারক আলভী'র একটি চিত্র দিয়ে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছে সংবাদ পত্রিকা। শিল্পী বিমূর্তভাবে সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থাপন করেছেন। ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি মাপের চিত্রটি পৃষ্ঠার ডান পাশে উপরের দিকে। অলংকরণটি ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদের অংশ বলে মনে হয় না, বরং কোনো প্রবন্ধের চিত্র বলে মনে হয় (চিত্র-৬৫)।

চিত্র-৬০
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৯৬)
শিল্পী : মামুন কায়সার

চিত্র-৬১
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯৬)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

২০০০ সালে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়। শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ 'ইত্তেফাক' পত্রিকার অলংকরণ

কোলাজ করে বিমূর্ত স্টাইলে কম্পোজিশন করেছেন (চিত্র-৬৬)। অর্ধপৃষ্ঠার মধ্যে হালকা হলুদ রঙের পটভূমির উপর বিভিন্ন মাপের টেক্সার দিয়ে ডিজাইন করা আয়তকার ফর্ম, পতাকা, ছেঁড়া রশি, মানুষের অবয়ব ড্রইং ইত্যাদির ফর্ম নিয়ে কোলাজ করে কম্পোজিশন করে প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন। পতাকা অঙ্কন যেভাবে করেছেন তাতে পতাকাটি নিচে পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং শিরোনাম পতাকার উপরে উঠে এসেছে যা দৃষ্টিকটু। শিল্পী বিমূর্তভাবে পরাধীনতার রশি ছিঁড়ে যে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের চিত্র অঙ্কন করেছেন সেটি কিছুটা ম্লান মনে হয়। ৪ রঙে ছাপা প্রচ্ছদটি দেখতে আকর্ষণীয়। 'সংবাদ' পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। শিল্পী ড্রাই ব্রাশের স্ট্রোকে মাথায় গামছা বাঁধা দু'জন মুক্তিযোদ্ধা হাতে রাইফেল ও পতাকা, পিছনে উদীয়মান সূর্যরশ্মি ড্রাই ব্রাশে অঙ্কিত, বাম দিকে উপরে শিরোনাম দিয়ে মাঝখানে ৪ কলাম ১০ ইঞ্চি মাপের অলংকরণ করেছেন। সাদামাটা উপস্থাপন, যা ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ হিসেবে একটু বেমানান। 'সংবাদ' পত্রিকা এভাবে সাদামাটা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণ করেছে (চিত্র-৬৭)।

দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত ঃ খণ্ডচিত্র

বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়

চিত্র-৬৪
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৯৯)
শিল্পী : বীরেন সোম

সংবাদ

স্বাধীনতা

উষার খড়্গ

চিত্র-৬৫
দৈনিক 'সংবাদ' (১৯৯৯)
শিল্পী : আবুল বারক আলভী

চিত্র-৬৬
দৈনিক 'ইত্তেফাক' (২০০০)
শিল্পী : মোমিন উদ্দীন খালেদ

চিত্র-৬৭
'সংবাদ' (২০০০)
শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

উপসংহার

দৈনিক পত্রিকা 'আজাদ', 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক', 'বাংলার বাণী', 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকাগুলোতে স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল 'আজাদ' পত্রিকা ক্রোড়পত্র প্রচ্ছদ অলংকরণ যেভাবে শুরু করেছিল তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছে এবং ১৯৯০ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। 'আজাদ' পত্রিকা ১৯৭২ সালে চমৎকার একটি ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ দিয়ে প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এবং এই ধারা ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৯৭৪ সালে কয়েকটি সাদাকালো ফটোগ্রাফি কম্পোজ করে প্রচ্ছদ অলংকরণ করে, '৭৬ সালে একটি সাদামাটা অলংকরণ দিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। '৭৭ সালে অপরিপক্ব হাতের একটি ড্রইং দিয়ে দুই রঙে ছাপা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এরপর ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের অলংকরণ একই, শুধু সাল পরিবর্তন করে প্রকাশ করেছে। 'বাংলার বাণী'ও একই অবস্থা শুরুটা বেশ রঙিন ও নান্দনিক অলংকরণ দিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করলেও ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের অলংকরণ দু-একটি বাদে সবই দুর্বল অলংকরণ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'দৈনিক বাংলা' পত্রিকারও একই অবস্থা ১৯৭৫/৭৬ সালের পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী এবং কোনো প্রকার রঙের ছোঁয়া লাগেনি। এর মধ্যে '৮২ থেকে '৮৯ পর্যন্ত এই অবস্থা বেশি খারাপ। ১৯৯০ সাল থেকে পত্রিকাটি বন্ধের আগ পর্যন্ত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণের মান ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটেছিল।

'ইত্তেফাক' পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণও ১৯৭২ সালে একটি জমজমাট অলংকরণ দিয়ে ডিজাইন করলেও ১৯৭৬ সালের পর থেকে বিশেষ করে আশির দশকে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ একটু সাদামাটা গোছের, বিশিষ্ট শিল্পীদের কাছ থেকে অলংকরণ করালেও তা সাদাকালোতে মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণ রঙিন হতে শুরু করে যা বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে রঙের আধিক্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে।

'সংবাদ' পত্রিকা কিছুটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়, কারণ স্বাধীনতা দিবসে ক্রোড়পত্র প্রকাশের শুরুতে পূর্ণপৃষ্ঠাজুড়ে অলংকরণ করলেও তা ছিলো সাদাকালোয় ছাপা। ১৯৭৭ সালে প্রথম দুই রঙে ছাপা ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র ছাড়া বর্তমান সময় পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদে রঙের আধিক্যতা দেখা যায়, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ দুই রং থেকে চার রঙে উন্নীত হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি পত্রিকার ক্রোড়পত্র দেখতে হয়েছে। দেখতে গিয়ে বা প্রবন্ধে উপস্থাপিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদের ছবি দেখে অনুমান করতে দ্বিধা হবে না যে, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন অরাজকতা বিরাজ করেছে তার প্রভাব পড়েছে মানবমনে, রুচিতে, অর্থনীতিতে এবং পত্রিকায়, ফলে এই সময় সাময়িকপত্রগুলো কখনো দায়সারা গোছের ম্লানভাবে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। আবার কোনো পত্রিকা শত বাধা উপেক্ষা করে দেশের জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ যাঁরা করেছেন তাঁদের স্মরণ করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেনি।

দৈনিক পত্রিকার ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ আঁকিয়ে হিসেবে যে সকল শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন–শিল্পী কামরুল হাসান, শিল্পী রণজিৎ নিয়োগী, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্পী কাজী আবদুল বাসেত, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল,

শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী বীরেন সোম, শিল্পী আবুল বারক আলভী, শিল্পী কাজী হাসান হাবীব, শিল্পী লুৎফুল হক, শিল্পী হামিদুল ইসলাম (হামিদ), শিল্পী মামুন কায়সার, শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ প্রমুখ। প্রত্যেক শিল্পী তাঁদের সৃজনশীলতা দেখিয়েছেন এবং **১৯৭১** সালে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ও বাংলার অসংখ্য মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল বাংলার আকাশে তা শিল্পীদের তুলির আঁচড়ে উঠে এসেছে পত্রিকার অলংকরণে। তবে সব সময়, সব প্রচ্ছদ অলংকরণে শিল্পী এই ভাব ফুটে ওঠেনি। কখনো কখনো ব্যর্থও হয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের প্রচ্ছদ অলংকরণে কখনো কখনো শুধু মুক্তিযুদ্ধই প্রাধান্য পায়নি, সাথে দেশের উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য করণীয় এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানও স্থান পেয়েছে। শিল্পী তাঁর চিন্তাশক্তি দিয়ে মানুষকে দেশাত্মবোধে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন।

* কৃতজ্ঞতা

অধ্যাপক মামুন কায়সার, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শঙ্কর তালুকদার, অধ্যাপক ঋতেন্দ্র কুমার শর্ম্মা ও অধ্যাপক গৌতম দত্ত এই প্রবন্ধ লিখতে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রক্ষিত দৈনিক সাময়িকপত্র থেকে ক্রোড়পত্রের ফটোগ্রাফি করেছি। পত্রিকাগুলো র‍্যাক থেকে টেবিলে এনে দিয়ে সাহায্য করেছে লাইব্রেরির স্টাফ জীবন কৃষ্ণ এবং ফটোগ্রাফি করতে সাহায্য করেছে আমার ছাত্র অর্ঘ অধিকারী, আয়েশা খাতুন, মো. নাফিজ রিমেল, প্রশান্ত কুমার মণ্ডল ও ফাহিম মাহমুদ।

শিশুর মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা

ভদ্রেশু রীটা*

সারসংক্ষেপ : শিশুরা চিত্রের মাধ্যমে অজানা বিষয়বস্তুকে চিনতে ও ধারণ করতে শেখে। একারণে শিশুকে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে লিখিত বর্ণনার চাইতে রঙিন চিত্র বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে শিশুর জ্ঞান আহরণ তথা মেধা বিকাশে একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো ইলাস্ট্রেশন। এর মাধ্যমে খুব দ্রুত শিশুর মনোজগতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিরস্থায়ী ছাপ তৈরি হয়। ফলে বিষয়টি সে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে গভীর আনন্দও লাভ করে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণ তাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয় এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও মননশীল হিসেবে গড়ে তোলে। ইলাস্ট্রেশন শিশুর এই জ্ঞান লাভ তথা মেধা বিকাশে কীভাবে সহায়তা করে, বর্তমান আলোচনায় মূলত সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই কৌতূহলপ্রবণ। একটি শিশু জন্মের পর থেকে নানারকম কৌতূহল মেটানোর বাসনা নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে বড় হয়। যতই সে বড় হয়, তার অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। শিশু তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ বিষয়ে শিশুর দৃষ্টিশক্তির ভূমিকা সম্ভবত সবচেয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন বস্তুর দিকে সে তাকায় তখন সেই বস্তুর আকার-রং-বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতির মাধ্যমে সে ধারণা অর্জন করে এবং বস্তুটি সম্পর্কে তার উপলব্ধি পূর্ণতা পায়। এভাবে স্বাভাবিক উপায়ে সে অনেক বস্তু চিনে নিতে শেখে। শিশুকে কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে লিখিত বর্ণনার চাইতে রঙিন চিত্র বেশি কার্যকর। কেননা, মানব-শিশুর সাধারণ ধর্ম হলো– একটি জিনিস সে আগে দেখে তারপর তার প্রতি জানতে আগ্রহী হয়। তাই শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শুধু লেখার ভাষা দিয়ে তার কৌতূহলদীপ্ত মনের ক্ষুধা মেটে না। একারণে অনেক ক্ষেত্রে জানার প্রতি তার অনাগ্রহ দেখা যায়। ফলে তার জানার ক্ষেত্রও অপূর্ণ থেকে যায়। ঠিক এখানেই রয়েছে ইলাস্ট্রেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এক্ষেত্রে শিশুর জ্ঞান আহরণে তথা মেধা বিকাশে একটি অনন্য ও কার্যকর মাধ্যম হলো ইলাস্ট্রেশন। কারণ, তথ্যের পাশাপাশি যদি তার দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক রঙিন দৃশ্যাবলি দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাতে দেখা ও জানা উভয়ই একসাথে হয়। এর ফলে জ্ঞাতব্য বিষয়টা সম্বন্ধে শিশু যেমন সম্যক ধারণা পায়, তেমনি তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম করাও তাদের পক্ষে সহজ হয় ; যা তার মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান আলোচনায় মূলত ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে তৈরি চিত্রভাষা শিশুর এই মেধা বিকাশে কীভাবে সহায়তা করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইলাস্ট্রেশনের উদ্ভব ও বিকাশ

সহজ কথায় ইলাস্ট্রেশন হলো– কোনো কিছুকে উদ্ভাসিত করা। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে কোনো কিছু প্রদর্শন করা ; ইংরেজিতে যাকে বলে 'illustrate'। ইংরেজি এই 'illustrate' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'illustrare' থেকে। এটি একটি ক্রিয়াপদ (verb), যার নামপদ (noun) হলো 'illustration'। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে আলোকপ্রভা (illumination), আধ্যাত্মিকতা (spiritual) এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানদান (intellectual enlightenment) ইত্যাদি বোঝাতে ইলাস্ট্রেশন শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন টেক্সট, গল্পকথন, কোনো বিষয় বা বস্তু, ঘটনা, ধারণা অথবা অনুভূতি ইত্যাদি দৃশ্যগতভাবে বর্ণনা করার একটি মাধ্যম হিসেবে 'ইলাস্ট্রেশন' শব্দটি সর্বাধিক পরিচিত। এক্ষেত্রে বর্ণনা শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি উল্লেখিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে দৃশ্যগতভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি তার ব্যাখ্যান (exposition)-ও প্রদর্শন করে।

চিত্রের মাধ্যমে কোনো কিছুকে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা মানব ইতিহাসে নতুন কিছু নয় ; প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই তা প্রচলিত। বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত গুহাচিত্র থেকে প্রাপ্ত আদি চিত্রগুলিই এর প্রমাণ। মজার ব্যাপার হলো– শিল্পকলার যতগুলি ক্ষেত্র রয়েছে, তার প্রায় সবগুলির আদি নিদর্শন বিভিন্ন গুহার দেয়াল থেকেই পাওয়া গেছে। ইলাস্ট্রেশন যে অর্থে সর্বজনবিদিত তা শুরু হয় মূলত *illuminated manuscript*[১] নামে পরিচিত মধ্যযুগের ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি থেকে (সূত্র : Joshua, 2018)। ১৫ শতকের মাঝামাঝিতে মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮ শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনায় এটি যুক্ত হতে থাকে। বিশেষ করে এসময়ে জনপ্রিয় লেখকদের বইতে ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার বইয়ের কাটতি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ (সূত্র : Chris, 2016)।

উপরোক্ত বিবরণের সূত্র ধরে বলা যায়– আদি বাংলায় প্রথম ইলাস্ট্রেশন দেখা যায় পাল পুঁথিচিত্রে। তবে, এদেশে ইলাস্ট্রেশনের ইতিহাস শুরু হয় মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে, মুদ্রণ যন্ত্র আবির্ভাবের পর। বিশেষ করে প্রযুক্তি-নির্ভর বিলেতি কায়দার মুদ্রণ শৈলীর ওপর ভিত্তি করেই এখানে ইলাস্ট্রেশনের প্রসার শুরু হয়। ১৭৭৮ সালে এদেশে বাংলা বই মুদ্রিত হলেও বইয়ের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন মুদ্রিত হতে প্রায় চার দশক সময় লেগেছে। ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' বইতে বাংলার শিল্পীদের আঁকা প্রথম ইলাস্ট্রেশনের দেখা পাওয়া যায় (সূত্র : অশোক, ২০১৩)।

শিশুদের জ্ঞান ও মেধা বিকাশে ইলাস্ট্রেশনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হয় ১৮৮০ সালে। এর প্রধান উৎস হলো– শিশুর বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে রচিত Friedrich Dietrich Tiedemann- নামের জার্মান গবেষকের একটি ডায়েরি। এটি ১৮৯৫ সালে *Observation on the Development of Chidren's Visual Faculties* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় ; যা শিশু-মনস্তত্ত্ব গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকে এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বই প্রকাশিত হতে থাকে (সূত্র : Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.), 2011)। এই গবেষণার প্রথম সফল ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বইয়ের মধ্যে অন্যতম– *পাফিন বুকস*[২] (Puffin Books) সিরিজ। অপরদিকে *ঠাকুমা'র ঝুলি*[৩] নামে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত শিশুদের রূপকথার

বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমেই মূলত অবিভক্ত বাংলায় ইলাস্ট্রেশনের নিজস্ব শৈলী গড়ে ওঠে। অধিকাংশ গবেষকের মতে, বইটির সংকলক-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার নিজেই বইয়ের চিত্রগুলি এঁকেছেন। এই চিত্রগুলি থেকেই মূলত বাংলার রাক্ষস-খোক্ষস ও অন্যান্য রূপকথার চরিত্রগুলির দৃশ্যরূপ প্রথম তৈরি হয় (সূত্র : শাওন, ২০০৭)। যদিও বাংলার ইলাস্ট্রেশনের জগতে অনেক গুণী শিল্পীই জড়িত ছিলেন, কিন্তু শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আলাদা করে যাদের নাম না বললেই নয়, তাঁরা হলেন অসামান্য প্রতিভাধর তিন পুরুষ– উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায় এবং সত্যজিৎ রায়। এঁদের মধ্যে সুকুমার রায়-এর অনবদ্য সৃষ্টি 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থের ড্রইংগুলি বাংলার শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন জগতে ভিন্ন মাত্রার এক সংযোজন ; যা মৌলিকত্বের দিক থেকে অনন্য, অসাধারণ।

বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর অবধারিতভাবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও পটুয়া কামরুল হাসানের মাধ্যমেই এদেশের ইলাস্ট্রেশনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। তবে, শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন চিত্রণে প্রথম কৃতিত্বের পরিচয় দেন কাজী আবুল কাসেম। তাঁর হাতেম তাই গ্রন্থের চিত্রগুলিতে– পরী, দানব, সাপ, পোশাক-পরিচ্ছদের সূক্ষ্ম অলংকরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে– সরদার জয়েনউদ্দীনের 'অবাক অভিযান', আশরাফ সিদ্দিকীর 'বাণিজ্যেতে যাবো আমি' ইত্যাদি কবিতার ইলাস্ট্রেশন (সূত্র : শাওন, ২০০৭)। স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনের জগতে বিশেষভাবে স্মরণীয় শিল্পী হাশেম খান ; যাঁর হাতে এদেশের অবহেলিত শিশুসাহিত্যের প্রকাশনা আকর্ষণীয় এবং গতিশীল হয়ে ওঠে। নিজস্ব শৈলীতে তিনি অজস্র বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রথম তিন দশকের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের অলংকরণ শিল্পী হাশেম খানের অংকিত। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বেশিরভাগ বইয়ের শিল্প সম্পদনায় রয়েছেন এই শিল্পী। সাম্প্রতিক সময়ে শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছেন বেশ কিছু তরুণ শিল্পী। তাঁদের মধ্যে সব্যসাচী মিস্ত্রী, মামুন হোসাইন, বিপ্লব চক্রবর্ত্তী, মেহেদী হক, নাজমুল আলম মাসুম, চিন্ময় দেবর্ষী প্রমুখ শিল্পী উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে ‘illuminated manuscript’
নামে পরিচিত ধর্মীয় পাণ্ডুলিপিতে
অংকিত ইলাস্ট্রেশন

পালযুগে পুঁথিতে অংকিত একটি ইলাস্ট্রেশন

রামচাঁদ রায় অংকিত ‘অন্নদামঙ্গল’ বইয়ের
একটি ইলাস্ট্রেশন

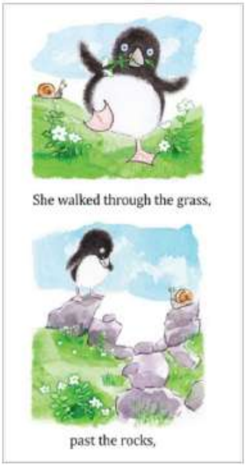

‘পাফিন বুকস’ সিরিজের একটি
বইয়ের পৃষ্ঠার ইলাস্ট্রেশন

১৮ শতকে রচিত
বিখ্যাত উপন্যাস
‘রবিনসন ক্রুসো’ বইয়ের
একটি ইলাস্ট্রেশন

১৯০৭ সালে প্রকাশিত ‘ঠাকুমার ঝুলি’
বইয়ের একটি ইলাস্ট্রেশন

‘আবোল তাবোল’-বইয়ে
উপস্থাপিত
শিল্পী সুকুমার রায়
অংকিত ‘ট্যাশ্ গরু’ এবং
‘খুড়োর কল’ নামের দু’টি
ছড়ার ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী হাশেম খান অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী কাজী আবুল কাসেম অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী হাশেম খান অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিল্পী সব্যসাচী মিস্ত্রী অংকিত ইলাস্ট্রেশন

শিশুর সংজ্ঞাপন ও ইলাস্ট্রেশন

শিশুরা চারপাশের বিষয়বস্তুকে চিহ্নিত ও শনাক্তকরণের বোধশক্তি অর্জন করে তাদের সংবেদনশীল জ্ঞান-ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিশুর সহজাত চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। এভাবে ক্রমশ তার শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা অর্জিত হয়। তবে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে শিশুর বোধশক্তি, প্রজ্ঞা, ধারণ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারিত হয় কোনো বিষয় সে কতটুকু আয়ত্ত করতে পারছে এবং এই বিষয়ের সঙ্গে সে কতটুকু খাপ খাওয়াতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে (সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৬৫)।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক John Brainerd এবং শিশু মনোগবেষক Gavin Bremner-এর মত অনুযায়ী– শিশুর

স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। একটি হলো সাদৃশ্যবিধান (Assimilation Capacity) এবং অন্যটি উপযোজন সামর্থ্য বা খাপ খাওয়ানো (Accommodation Capacity)। সাদৃশ্যবিধান (Assimilation) হলো– বিদ্যমান কোন চিন্তা / ধারণা / অনুভূতি / বিশ্বাস বা কল্পনার সঙ্গে নতুন কোন তথ্য সংযুক্ত করা। অন্যদিকে উপযোজন (Accommodation) হলো– পূর্বের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুন আয়ত্ত করা ধ্যান-ধারণার খাপ খাওয়ানো। অর্থাৎ পূর্বে দেখা কোনো বস্তুর সঙ্গে একই আকৃতির অন্য বস্তুর তুলনা করা এবং পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হওয়া (সূত্র : Brainerd, 1996 ; Bremner, 2001)। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন : একটি শিশু যদি খেলার সামগ্রী 'বল' দেখে তবে বল আকৃতির সকল নতুন বস্তুই তার কাছে 'বল' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এটি হলো সাদৃশ্যবিধান। আবার, শিশু যদি পূর্বে 'বল' দেখে থাকে তবে সে বল আকৃতির অন্য যেকোনো বস্তুকে বলের মতো মনে করে। কিন্তু বস্তুটি যে মূলত বল নয় তাও সে বুঝতে পারে। নির্দেশ করার সময়ে তাই সে উল্লেখ করে 'বলের মতো গোল'। অর্থাৎ সে হয়তো নতুন দেখা বস্তুটি কী জানে না কিন্তু আকৃতিটি বলের মতো সেটা উপলব্ধি করতে পারে। পরে যখন নতুন দেখা বস্তুটির সম্পর্কে জানতে পারে তখন সে তার আগের ধারণার সঙ্গে নতুন জানা তথ্যটির উপযোজন ঘটায় (সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৬৬)। এটি হলো কোন কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা উপযোজন করা। এভাবে সাদৃশ্যবিধান এবং উপযোজনের মাধ্যমে শিশু তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কথা এবং বিশেষ করে ইমেজের সাহায্যে। অর্থাৎ শিশু দৃশ্যগত বস্তুর ছবি দেখে নাম বলতে ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে শেখে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমিকভাবে শিশুর জ্ঞান আহরণের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ছবি বা চিত্র প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এ বিবেচনায় শিশুর পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে প্রাথমিক অভ্যস্ততা তৈরির জন্য বইতে ছবি বা চিত্র উপস্থাপন করা জরুরি বলে মনে করা হয়। কারণ, বইতে হরেক রকম তথ্য থাকলেও শিশুদের অস্পষ্টতা অনেক সময়েই যথার্থরূপে দূর হয় না। যার দরুন অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি তাদের বোঝার বাইরে থেকে যায়। এমতাবস্থায় প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি বা চিত্রের উপস্থাপনা। এসমস্ত চিত্র থেকে খুব দ্রুত শিশুর মনোজগতে নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু সম্পর্কে চিরস্থায়ী একটি ছাপ তৈরি হয়। শিশু যখন

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বস্তু দেখতে কেমন তা জানার কৌতূহল প্রকাশ করে। তখন তথ্য বা কাহিনির পাশে যদি উক্ত বিষয় বা বস্তুর দৃশ্যগত বর্ণনা তথা ইলাস্ট্রেশন দেখতে পায়, তখন সে বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং সেই সাথে গভীর আনন্দও লাভ করে। এই আনন্দ তাকে পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে ; যা তাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয় এবং সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও মননশীল করে গড়ে তোলে। এ বিষয়ে কানাডার উইনিপেগ বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং শিশু-সাহিত্যিক Perry Nodelman (1996)-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> '... because they find them easier to understand than words and need pictorial information to guide their response to verbal information.' (Nodelman, 1996 : 216)

আরও নির্দিষ্ট করে বললে ইলাস্ট্রেশন–

● বইয়ের নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে শিশুকে একটি পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি দেয়। এটি তাৎক্ষণিক তথ্য সরবারহ করতে সাহায্য করে এবং প্রায়শই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ যোগ বা হাস্যরস তৈরি করে শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট করে ; যা হয়তো মূল লেখায় অন্তর্ভুক্ত নেই।

● পড়তে সক্ষম হওয়ার পূর্বেই শিশুর বইয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করে। বইয়ের রচিত সকল টেক্সট বুঝতে পারুক বা না পারুক উজ্জ্বল রং এবং পরিচিত-অপরিচিত নানান অভিব্যক্তির চরিত্র ও তাদের অভিনব উপস্থাপনের কারণে নির্দিষ্ট সময় অব্দি শিশু বইয়ের প্রতি মনোযোগী থাকে।

● প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে শিশুর কথোপকথনের সুযোগ তৈরি করে। অর্থাৎ শিশু চিত্র সম্পর্কে নানান ধরনের প্রশ্ন করে। 'এটা কি?', 'এটার রং এমন কেন?', 'ও কাঁদছে কেন?', 'ওরা কী খাচ্ছে?' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং যথাযথ উত্তর শোনার মধ্য দিয়ে শিশু বইয়ের মাঝে ব্যস্ত থাকে ; যা তার ভাষার দক্ষতা এবং নতুন নতুন শব্দ শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

● শিশুদের সৃজনশীল চেতনা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ শিশুর সুকুমার বৃত্তি তথা ইতিবাচক সৃষ্টিশীল মানস গঠনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে।

● বিভিন্ন রচিত বিষয়-বস্তু চিনতে ও তাদের নিয়ে শিশুদের ভাবতে শেখায়। ফলে তাদের একটি কল্পনার রাজ্য তৈরি হয়। পড়তে পড়তে সেখানে তারা বিচরণ করে এবং সর্বোপরি তাদের মানসলোকে বিষয়বস্তুটি ধারণ করতে পারে। সহজ কথায় চিত্রের মাধ্যমে শিশু বুঝতে পারে গল্প বা ছড়ার চরিত্রগুলি দেখতে কেমন। যেমন : গল্পের কে রাক্ষস আর কে রাজকন্যা ; কে দুষ্টু লোক আর কে ই বা রাজপুত্র, চারপাশের আবহ ইত্যাদি। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুর এমন এক অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, যেখানে ক্ষেত্র বিশেষে শিশু নিজেই গল্পের একজন চরিত্র হয়ে যায়। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি তৈরি হয়।

● বইয়ের টেক্সট সম্পর্কে দৃশ্যগত ধারণা দেয়ার পাশাপাশি পড়ার কৌশল আয়ত্তকরণেও শিশুকে সাহায্য করে। কী পড়ছে, কীভাবে ভাবলে তা অর্থপূর্ণ হবে– তা শেখার জন্য উপস্থাপিত চিত্রগুলি শিশুর জন্য এক ধরনের মডেলস্বরূপ। এর ফলে শিশু যখন স্বাধীনভাবে পড়তে শেখে, তখন সে নিজের পড়ার বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্য অনুরূপ কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

● বইয়ের সঙ্গে শিশুদের একধরনের আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে শিশু বই বোঝার দক্ষতা অর্জন করে। বিশেষ করে চিত্রিত ছবির মাধ্যমেই শিশু বই ধরার সঠিক ভঙ্গি বুঝতে পারে। এছাড়া বইয়ের কোনটা প্রথম পৃষ্ঠা, কোনটা শেষ পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার উপর-নিচ দিক সম্পর্কে শিশুর প্রাথমিক জ্ঞান তৈরি হয়।

বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশন ও শিশুদের মেধা বিকাশে এর ভূমিকা

বইয়ের ইলাস্ট্রেশন শিশুদের ক্ষেত্রে তথ্যের নিরব অথচ প্রধান একটি উৎস। এটি শিশুদের অনুমানভিত্তিক বোধগম্যতা শানিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শেখা বা আনন্দ যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের পড়াশোনার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা-বোঝা। এই জানা ও বোঝার সময়ে রচিত লেখার সঙ্গে শিশু তার মানসিক কল্পমূর্তি তৈরি করতে চায়। তার এই চাহিদা পূরণ করে ইলাস্ট্রেশন। তাই বয়স-উপযোগী শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলাস্ট্রেশন তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দর্শনে এগুলির মাধ্যমে শিশুদের

মনোযোগ আকৃষ্ট করাই এর মূল উদ্দেশ্য। একারণে শিশুদের ইলাস্ট্রেশনযুক্ত বইতে (বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশন) টেক্সটের তুলনায় ইলাস্ট্রেশনগুলিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। যেহেতু ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিশুরা ইতিহাস-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিষয়েও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে থাকে, তাই এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনেরও বিচিত্র ধরন দেখা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে একই কৌশল অবলম্বনে এসমস্ত ইলাস্ট্রেশন অংকিত হয় তা নয়, বরং রংয়ে-রেখায়-ছন্দে থাকে ভিন্নতা। কোথাও কলমের আঁচড়ে মূর্ত হয় ঝাপসা হয়ে যাওয়া পুরনো দিনের হাতিয়ার ; কোথাও তুলির ছোঁয়ায় প্রাণ পায় হারিয়ে যাওয়া আদিবাসীর ঘর-বাড়ি ; কোথাও ফটোগ্রাফির আলো-আঁধারিতে হেসে ওঠে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ; আবার কোথাও বা জলরংয়ের ওয়াশে জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে আদিম মানুষের ধূসর কাহিনী। ধরন যাই হোক না কেন, রং দিয়ে শিশুরা যেমন প্রথম প্রকৃতিকে চিনতে শেখে, তেমনি বইয়ের পাতার ইলাস্ট্রেশন দিয়ে সে তার চেনা-জানার পরিসরকে বর্ধিত করে।

শিশুদের ইলাস্ট্রেশন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রধান তিন ধরনের ইলাস্ট্রেশন নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশন : এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনে বিষয়বস্তুর প্রকৃত গড়নকে বিকৃত (distorted) না করে কিছুটা মজাদার, হাস্যরসাত্মক আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। এগুলি সহজ, সরল প্রাথমিক ফর্মে আঁকা ইলাস্ট্রেশন ; যা সাধারণত আলো-ছায়াবিহীন উজ্জ্বল ফ্ল্যাট রং-এ অঙ্কিত হয়ে থাকে। রং, রেখা বা গড়নে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশনের সঙ্গে বিষয়বস্তুর বাস্তবিক ত্রিমাত্রিকতা বা পরিপ্রেক্ষিতের তেমন কোনো সাদৃশ্য থাকে না। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিতও হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে নির্দিষ্ট বস্তুর চরিত্র নিরূপণে শিশুর কোনো সমস্যা হয় না। কারণ বাস্তবধর্মী না হলেও এগুলি বাস্তব আদলকে ভিত্তি করে সরলভাবে আঁকা হয়। ফলে চেনা চরিত্রের অসাধারণ উপস্থাপনের ছবির মাধ্যমে শিশু আকৃষ্ট হয়। সাধারণত শিশুতোষ ছড়া, কবিতা, গল্প, কমিকস্ ইত্যাদির ইলাস্ট্রেশনে কার্টুনধর্মী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু ইলাস্ট্রেশন উপস্থাপন করা হলো–

চিত্র নং-১

কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশনের কিছু নমুনা

চিত্র নং-২

চিত্র নং-৩

উপস্থাপিত ছড়া ও গল্পের ইলাস্ট্রেশনগুলি (চিত্র নং-১, ২, ৩) কার্টুনধর্মী হলেও এখানে তিন ধরনের শৈলী বিদ্যমান। প্রতিটি চিত্রের ক্ষেত্রে ফিগারের দেহের গড়ন, চেহারা, চুলের ধরন ইত্যাদিতে ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে (চিত্র নং-১) ফিগারের অঙ্গসৌষ্ঠবে সরলীকরণ থাকলেও তাতে হাত-পা'য়ের ভাঁজ, চুল বাঁধার ভঙ্গি, পাখির ড্রইং, কাশফুলের ঝোপ ও ঘাসে তুলির টানের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে পুরো চিত্রে একধরনের গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে (চিত্র নং-২) উপস্থাপিত শিশুদ্বয়ের চেহারা এবং দেহের ড্রইং একই মাত্রার স্ট্রোকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ফলে এদের গোটা অঙ্গে পুতুল সদৃশ এক ধরনের কাঠিন্য থাকলেও উজ্জ্বল উষ্ণ রং ফিগার দু'টিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৩) ফিগারগুলির শরীরের তুলনায় ছোট পা, সরু গলাযুক্ত ব্যতিক্রমী বড় মাথা, হাস্যরসযুক্ত অভিব্যক্তি ইত্যাদিতে রয়েছে লাইনের ছন্দময় উপস্থাপন। ফলে ফিগারগুলিতে এক ধরনের নমনীয় ভাব তৈরি হয়েছে।

এধরনের কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে শিশু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। যেমন : ১. চিত্রিত উপাদান থেকে রেখা, বিন্দু, রং ইত্যাদি শনাক্তকরণ। ২. ত্রিমাত্রিক বস্তুর দ্বিমাত্রিক ফর্মে উপস্থাপন সম্পর্কে জ্ঞান। ৩. দৃশ্যগত উদাহরণ শেখার বোধশক্তি অর্জন ইত্যাদি (সূত্র : DeLoache, Strauss & Maynard, 1979 : 77-89 ; Nodelman, 1988: 35)। বাস্তব বিষয়বস্তুর দৃশ্যগত ফর্ম তৈরির জন্য শিশুর এই উপলব্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা, দৃশ্যগত এ ধরনের ফর্ম তৈরির মাধ্যমে একদিকে যেমন বস্তু এবং দৃশ্যচিহ্ন সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান অর্জন সহজ হয়, অন্যদিকে দৃশ্যগত ভাষা (visual grammer)-র নিয়মাবলী আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রতিটি ইলাস্ট্রেশন থেকে শিশু যে একই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে তা নয়। ইলাস্ট্রেশন থেকে কোন বিষয়টি শিশুর সংজ্ঞাপন তৈরিতে সাহায্য করবে, তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শিশুর গ্রহণ করা জ্ঞানের পরিধির ওপর। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেমন : উল্লেখিত ইলাস্ট্রেশনগুলির ক্ষেত্রে বলা যায়– শিশু প্রথম চিত্র (চিত্র নং-১) থেকে কাশফুল সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেননা, ধরে নেয়া যায় এখানে উপস্থাপিত উড়ন্ত পাখি, মেয়ে শিশু, ঘাসের ড্রইং শিশুর পরিচিত। কিন্তু যেহেতু অবস্থানগত কারণে কাশফুল সচরাচর দেখা যায় না তাই এটি তার কাছে নতুন কোনো বস্তু। প্রথম দর্শনে সে হয়তো তার পরিচিত ঘর পরিষ্কার করার ঝাড়ুর সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে যখন শিশু এর প্রকৃত পরিচয়টি জানতে পারবে, তখন সে চেনা ঝাড়ুর সঙ্গে এর উপযোজন ঘটাবে। অর্থাৎ ঝাড়ুর মতো দেখতে হলেও তা একটি ফুল তা সে জানতে পারবে। এভাবে কাশফুল সম্পর্কে শিশুর একটি ধারণা তৈরি হবে এবং তার জ্ঞান ভাণ্ডারে নতুন একটি অনুষঙ্গ যুক্ত হবে। আবার দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র নং-২) উপস্থাপিত সকল উপাদানই হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু তার চেনা বস্তুর এমন উজ্জ্বল রংয়ের সাথে সে হয়তো অপরিচিত। ফলে তার মনে রং সম্পর্কে এক ধরনের কৌতূহল তৈরি হবে। এর থেকে সে রংয়ের বিভিন্ন ধরন এবং উপাদান বিষয়ে শিশুর জানার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং তার আঁকার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৩) প্রদর্শিত প্রতিটি উপাদানই হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু চিত্রিত ফিগারের অভিব্যক্তি এবং দেহভঙ্গিমা হয়তো তার অচেনা। ফলে এখান থেকে সে নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের অভিব্যক্তি (expression) ও দেহভঙ্গিমার (body language) নির্দিষ্ট ভাষা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন : সাধারণত শিশুদের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন অতি মাত্রায় বাস্তবধর্মী হতে দেখা যায় না। বাস্তবধর্মী বলতে এখানে বোঝানো হয় বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ বাস্তবসম্মতভাবে সমানুপাতিক। অর্থাৎ বস্তু বা প্রাণীর বাস্তব গড়ন অনুযায়ী যথাসম্ভব বিশদভাবে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশনগুলি হয় সরল কিন্তু বিস্তারিত। ক্ষেত্র বিশেষে এগুলিতে আলো-ছায়ার ব্যবহার থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু রং ব্যবহারে প্রকৃতির প্রচলিত রংকেই সাধারণত প্রাধান্য দেয়া হয়। শিশুতোষ ফিকশন বই ছাড়াও শিক্ষামূলক বিভিন্ন নন-ফিকশন বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কারণ, এ ধরনের ইলাস্ট্রেশন নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বর্ণনা ও আবহকে এমনভাবে অঙ্কন করে থাকে, যা জটিল শিক্ষামূলক বিষয়কেও শিশুদের কাছে শক্তিশালীভাবে প্রাণবন্ত ও বোধগম্য করে তোলে।

চিত্র নং-৪

চিত্র নং-৫

চিত্র নং-৬

বাস্তবধর্মী
ইলাস্ট্রেশনের
কিছু নমুনা

এখানে তিনটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৪, ৫, ৬) উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তিন ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে বাস্তবধর্মী রূপে আঁকা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটিরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আমেজ। প্রথমটি একটি গল্পের ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৪) ; যেখানে প্রতিটি

উপাদানে নিজস্ব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান। গাছের টেক্সচার থেকে শুরু করে ফিগারের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাকের ভাঁজ, বিড়ালের শরীরের ক্ষুদ্র লোম পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ড্রইংয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপস্থাপন এবং রং নির্বাচন এগুলিকে নিজ রূপের আদলে মূর্ত করেছে অত্যন্ত সফলভাবে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যথাযথ আলো-ছায়ার ব্যবহার ; যাতে তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিকতা। ফলে প্রতিটি চরিত্র এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টি শিশুতোষ ছড়ার একটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৫)। এক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানে পর্যাপ্ত আলো-ছায়ার ব্যবহার না থাকার দরুন এখানে স্বাভাবিক মাত্রা তেমন পাওয়া যায় না। তবে, ড্রইংয়ের সূক্ষ্মতা এবং ছন্দময়তা প্রতিটি আলাদা বিষয়বস্তুকে নিজস্ব চরিত্রে দৃশ্যায়িত করেছে। এর সঙ্গে উজ্জ্বল রংয়ের ব্যবহার চিত্রটিকে এক ধরনের আনন্দময় এবং প্রাণবন্তময় অনুভূতির জন্ম দেয়। তৃতীয় চিত্রটি (চিত্র নং-৬) পরিবেশের ওপর রচিত একটি লেখার ইলাস্ট্রেশন। এখানে লাইনের সূক্ষ্মতার পাশাপাশি রংয়ের তারতম্য এবং আলো-ছায়ার ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। একারণে হরিণ এবং গাছগুলিতে একধরনের ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে। অপরদিকে দূরের গাছ, হরিণের পাল এবং কাছের গাছ ইত্যাদি পরস্পরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দূরত্ব শুধু যে ড্রইংয়ে তা নয়, বরং রংয়েও পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ পুরো চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা দেয়া হয়েছে। ফলে চিত্রটিতে একটি বিস্তৃর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রতীয়মান হয় ; যা লিখিত বিষয়বস্তুর একটি দৃশ্যগত বাস্তব রূপ।

এধরনের বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টিশক্তিকে পরিস্ফূট করে। অপরদিকে বাস্তবাকৃতি পরিচিত চিত্র এবং টেক্সটের অধিক সংখ্যক অজানা শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে শিশুর বোধগম্যতা বাড়িয়ে তোলে। যেহেতু এ ধরনের ইলাস্ট্রেশন টেক্সটের বিবরণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে, সেহেতু অজনা তথ্য খুব দ্রুত শিশুর মস্তিস্কে জায়গা করে নেয়। এভাবে বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিশুর জানার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার বোধও তীক্ষ্ণ হতে থাকে। ফলে শিশু সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে খাপ খাওয়ানোর বোধ, সম্পর্ক ও চেতনা অনুধাবন করতে শেখে।

এক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী ইলাস্ট্রেশন একটি টেক্সটের বিশদ বর্ণনার পুরোটাই দৃশ্যায়িত করে, তা নয়। তবে, এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনগুলিতে অতিরিক্ত অনেক তথ্য থাকে, যা শিশুকে টেক্সটের পুরো আবহ বুঝতে সাহায্য করে। যেমন : উপযুক্ত

ইলাস্ট্রেশনের (চিত্র নং-৪) ক্ষেত্রে ধরা যাক গল্পে বিড়াল আর শিশু দু'টি কী করছে, কেন করছে সে বিষয়ে হয়তো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা নেই। সেক্ষেত্রে আকাশের মেঘ, পড়ে থাকা গাছের চিত্র থেকে শিশু গল্পের আবহ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবে, যা অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তার মস্তিস্কে সংরক্ষিত হবে। আবার, চিত্রিত মানুষের ফিগার দু'টি এবং বিড়ালগুলি হয়তো শিশুর পরিচিত। কিন্তু এখানে দু'টি ফিগারের পোশাক দুই রকম এবং শিশুর কাছে হয়তো তার একটি অপরিচিত। এক্ষেত্রে শিশু অতিরিক্ত তথ্য পাবে এই চিত্র থেকে, যা হয়তো গল্পে উল্লেখ নেই। এভাবে শিশু গল্প থেকে যেমন নতুন শব্দ জানতে পারে, তেমনি ইলাস্ট্রেশন থেকেও নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রের (চিত্র নং-৫) ক্ষেত্রেও শিশু বাড়তি অনেক তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। এটি চার লাইনের একটি ছড়ার ইলাস্ট্রেশন ; যেখানে মা আর মেয়ে থাকলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে রচিত খুকুমনির ঘরের আঙ্গিনার পুরো পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে খুকু আর তার মায়ের পাশাপাশি শিশু অতিরিক্ত তথ্য জানতে পারবে, যেমন : খুকুর বাড়িতে পাখি আছে, বিড়াল আছে, ফুলের বাগান আছে ইত্যাদি। এই অধিক সংযোজিত চিত্রের সঙ্গে শিশু তার পরিচিত বাড়ির সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করবে। ফলে বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে তার জ্ঞাত ধারণার পাশে স্থান করে নেবে অচেনা সকল অংশ। তৃতীয় চিত্রের (চিত্র নং-৬) ক্ষেত্রে হয়তো বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো বনের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে সেই বর্ণনার দৃশ্যগত অংশের পাশাপাশি না বলা কিছু বাড়তি দৃশ্য শিশু অবলোকন করতে পারবে, যেমন : বিভিন্ন ধরনের গাছের উচ্চতা ও বৈশিষ্ট্য, গাছ ও পানির পাশাপাশি অবস্থান, নির্দিষ্ট প্রাণির দল বেঁধে বিচরণ, তাদের পানি খাওয়ার ধরন ইত্যাদি। এর ফলে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর ধারণা আরও স্বচ্ছ হবে এবং এই সম্পর্কে তার চেতনবোধও বৃদ্ধি পাবে।

শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশন : এধরনের ইলাস্ট্রেশনে বিষয়বস্তু মূলত শিল্পীর নিজস্ব শৈলীতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। একারণে এগুলি বাস্তবধর্মী বা কার্টুনধর্মী যেভাবেই চিত্রিত হোক না কেন, তাতে বৈচিত্র্যময় রূপ দেখা যায় অধিক মাত্রায়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আকৃতির ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অস্বাভাবিক অথচ মজাদার নানান আকৃতিতে উপস্থাপিত হতে পারে। তাই তো চারপেয়ে পরিচিত চরিত্র যখন সেজেগুজে রঙিন শার্ট গায়ে দিয়ে দু'পায়ে চলতে থাকে, বা পাখি চোখে কাজল মেখে মালা পরে গান গায়, মেঘের অবাক দৃষ্টিযুক্ত চোখ তৈরি হয়, অথবা মানব অবয়বের চেনা গড়ন অসাধারণ হয়ে ওঠে, তখন

শিশুর মনে ছবির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়, বাড়িয়ে তোলে তার কৌতূহল। রং ব্যবহারেও এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছেমতো যেমন খুশি তেমন রং ব্যবহৃত হতে পারে। তাই সাদা মেঘ হতে পারে রঙিন, অথবা সবুজ গাছ হতে পারে সাদা। এক্ষেত্রে প্রায়শই বিষয়বস্তুতে বা ব্যাকগ্রাউন্ডে লোকজ নকশা, টাইপোগ্রাফি অথবা ডিজাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ক্ষেত্র বিশেষে শিশুতোষ বিভিন্ন ফিকশন বইয়ে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশন উপস্থাপিত হতে পারে। ব্যতিক্রমী রং, গড়ন ও টেক্সচারের কারণে এই ধরনের ইলাস্ট্রেশন চট্ করে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই শিশু চিত্রিত ছবির দৃশ্যগত ভাষা বোঝার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে চিত্র বিষয়ে লেখা টেক্সট পড়া এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহী হয়। এভাবে ক্রমশ শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং পড়ার প্রতি তার আগ্রহ বাড়ে। উপরন্তু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে শিশুর জ্ঞান পিপাসাও বিস্তৃত হয়।

চিত্র নং-৭

চিত্র নং-৮

চিত্র নং-৯

শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশনের কিছু নমুনা

এখানে শৈলীপ্রধান কয়েকটি ইলাস্ট্রেশন (চিত্র নং-৭, ৮, ৯) উপস্থাপিত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট কিছু গল্পের দৃশ্যগত রূপ। প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে (চিত্র নং-৭) দেখা যায়–

একটি শিশুর ঘরের পাখাযুক্ত জানালার আকাশে উড়ে যাওয়ার দৃশ্য। এখানে প্লেন আকৃতির রঙিন পাখি, নানান রংয়ের মেঘের মধ্যে প্যাঁচানো ফর্ম, সমুদ্রের সর্পিলাকার ভিন্ন ধরনের ঢেউ, গোলাপী পানিতে হরেক রকম মাছের চলাফেরা– সবই যেন শিশু মনকে কল্পলোকের এক ঠিকানার সন্ধান দেয়। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৮) দুই ধরনের শৈলীর সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এখানে রমণীর সঙ্গে আলিঙ্গনরত শিশুর ফিগার দু'টি কার্টুন বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু রমণী নিজে দৃশ্যায়িত হয়েছে ব্যতিক্রমী ঢঙের বেশ-ভূষণে। যদিও শাড়ি পরিহিতা নারীটি প্রোফাইলভাবে কুণ্ডলায়িত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, তথাপি তার শাড়ির কুচিগুলি সামনের দিকে ফেরানো ; যেন তা শাড়ি আর ঘাগড়ার সংমিশ্রণ। আবার অন্যভাবে দেখলে কিছুটা যেন কিউবিজম ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার নারীর মুখমণ্ডল সহজ সরল এক স্ট্রোকে আঁকা, কিন্তু চুলগুলি নিখুঁত লাইনে সুললিত কুণ্ডলীতে পরম যত্নে সাজানো। তৃতীয় চিত্রে (চিত্র নং-৯) উপস্থাপিত উপকরণে বাংলার দেশজ চিহ্ন স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। এখানে দুইপাশের গাছগুলি চিত্রায়িত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠার নকশার আদলে। ফিগারটিও বাংলার লোকজ ফর্মের আদলে অঙ্কিত। আবার পানি, পদ্ম ফুল, পাতাতে রয়েছে স্বাভাবিক দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ। ইলাস্ট্রেশনটি দেশজ ও স্বাভাবিক উপকরণে সজ্জিত ভিন্ন মাত্রার একটি উপস্থাপন, যা শিশুমনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়ার জন্য যথেষ্ট উপযোগী।

এ ধরনের শৈলীপ্রধান ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে চেনা বিষয়বস্তুর অস্বাভাবিক উপস্থাপন শিশুর কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে চিত্রের নানান শৈলী সম্পর্কে শিশুর ধারণা জন্মায় এবং নিজ সংস্কৃতিকে চেনার প্রয়াস পায়। সেই সঙ্গে তারা রূপক বা উপমার ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে শেখে। পাশাপাশি বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি হয় : যার দরুন পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে শিশুর স্বতন্ত্র মতাদর্শ তৈরি হয়। এছাড়া এ ধরনের ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে শিশু প্রাথমিকভাবে বিষয় বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করে এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তাদের মনে বিকল্প পদ্ধতি শেখার উপায় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়।

এই ধরনের চিত্র থেকে শিশু প্রচুর নতুন নতুন বিষয় এবং তার ভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। যেমন : উপরে বিবৃত প্রথম ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৭) চিত্রিত পরিচিত ঘরের জানালার উদ্ভূত পাখনা শিশুমনে তার চেনা ও জানার গণ্ডিকে ভিন্ন

এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সুযোগ করে দেবে। বাস্তবে জানালার যে পাখা থাকে না সে বিষয়টি শিশু হয়তো জানে। ফলে এখানে পাখার উপস্থাপন এবং মেঘ, পাখি, পানির অচেনা শৈলী তার চিন্তার পরিধি বাড়িয়ে দেবে : এ থেকে শিশুর চারপাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের থেকে ভিন্নভাবে দেখার চোখ তৈরি হবে। আবার দ্বিতীয় ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৮) টেক্সটে উল্লিখিত মায়ের রূপকে দেখানো হয়েছে অনেক বড়, ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে। যেহেতু শিশুর জন্ম থেকেই মা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাই 'মা'কে হয়তো আলাদা করে শিশুরা তেমন ভাবে না। 'মা' তাই সবসময় তাদের কাছে ভালোবাসার, আদরের ব্যতীত অন্য কিছু হয়তো হয়ে ওঠে না। এখানে 'মা'-এর ভিন্ন মাত্রার উপস্থাপন শিশুর মনে 'মা'কে অন্য এক রূপে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। শিশুর মনে মায়ের প্রতি যে আসন, অবস্থান, মর্যাদা– এগুলোর ভাবগত জ্ঞান তৈরিতে সাহায্য করবে। তৃতীয় ইলাস্ট্রেশনে (চিত্র নং-৯) নকশি পিঠার আদলে গাছের চিত্র বিভিন্ন বিষয়ে রূপকের ব্যবহার সম্পর্কে শিশুর ধারণা তৈরি করবে। অপরদিকে ফিগারের তুলনায় বড়ো ফুল, পাতা এবং ঝিনুকের চিত্র থেকে শিশু বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে তুলনা এবং ভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে–ইলাস্ট্রেশন পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে শিশুর অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় করার কার্যকর একটি মাধ্যম। শিশুর চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে এটি বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তাই শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের গঠনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত করা অত্যন্ত জরুরি; যেখানে ইলাস্ট্রেশনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশে অধিকাংশ অভিভাবক শিশুর পুথিগত পড়াশোনা নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার সুষ্ঠু বিকাশ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ঠিক ততটাই উদাসীন। এদেশের বিদ্যালয়গুলোতেও প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা যেরকম গঠনমূলক হওয়া উচিত, তেমনটা দেখা যায় না। তবে অল্প কয়েকটি বিদ্যালয়ও রয়েছে, যেখানে শিশুদের মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের পাঠক্রম তৈরি হয় এবং সেই অনুযায়ী শিশুরা গঠনমূলক নানা কার্যক্রমের পাশাপাশি আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। সেখানে প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন পাঠের সঙ্গে শিশুদের ছবি আঁকা বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। এ ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে চট্টগ্রামে অবস্থিত ফুলকি, ঢাকায় অবস্থিত অরণি, নালন্দা, সহজ পাঠ ইত্যাদি বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। যাই হোক, তথাকথিত সফল মানুষ হওয়া নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় এবং ঘরে প্রাণপণ লড়াইয়ের মাঝে শিশুদের স্বস্তি দান এবং মানবিক

বিকাশে প্রয়োজন ইলাস্ট্রেশনযুক্ত শিশুতোষ বিভিন্ন ধরনের বই। কিন্তু প্রতিবছর এখানে বইমেলায় শত শত শিশুতোষ বই থাকলেও ভালো বিষয়বস্তু ও আকর্ষণীয় ইলাস্ট্রেশনের অভাবে এগুলোর বেশিরভাগই উপযোগিতাসম্পন্ন হয় না। এর কারণ হয়তো বাংলাদেশে শিশুতোষ বইয়ের টেক্সটকে দৃশ্যগতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ইলাস্ট্রেশন শিল্পীর অভাব। তার মানে এই নয় যে, শিল্পীরা এ ব্যাপারে অনাগ্রহী, বরং এক্ষেত্রে শিল্পীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করার রেওয়াজ রয়েছে বাংলাদেশে। ফলে অনেক যোগ্য শিল্পী এ পেশায় আসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। এ সত্ত্বেও পূর্বে উল্লিখিত কিছু সংখ্যক তরুণ শিল্পী এদেশের শিশুতোষ ইলাস্ট্রেশনকে একটি মান সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

উপসংহার

কোমলমতি শিশুরা নতুন প্রজন্মের ধারক ও বাহক। তাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন গুণগত দিক নির্দেশনা। শিশুরা চিত্রের মাধ্যমে অজানা বিষয়বস্তুকে চিনতে শেখে, ধারণ করতে শেখে এবং সত্যিকার অর্থে চিত্র ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি সহজে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের এই প্রবণতাকে ব্যবহার করে শিশুর মেধা বিকাশের পর্বগুলোতে ইতিবাচক বহুমুখী শিক্ষাচর্চা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেশন প্রধান সহায়ক হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ বিষয়ে যদিও ইউনিসেফ কর্তৃক নানান ধরনের কার্যকলাপ শিশু এবং তরুণদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে অবদান রাখছে, কিন্তু শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সচেতনতাই এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে সফলভাবে।

টীকা

১. **Illuminated Manuscript :** এগুলো সোনা অথবা রুপার গুঁড়া মেশানো রং দিয়ে অংকিত অলংকরণযুক্ত হাতে-লেখা ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি। এই ধরনের রং ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বইগুলোকে আলোকপ্রভার একটা অনুভূতি প্রদর্শন করা। এগুলা তৈরি হতো ধর্মীয় মঠের 'Scriptoria' নামের এক ধরনের অতি পবিত্র কক্ষে। এই পাণ্ডুলিপিতে বিষয়বস্তু রচনার শুরুর অক্ষরটি অন্য লেখার তুলনায় অনেক বড় এবং নকশা দিয়ে আবৃত করা হতো। মূলত অলংকরণগুলি করা হতো লেখার চারপাশে। মাঝে মাঝে লেখার মাঝে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

ইলাস্ট্রেশন সংযুক্ত হতো। তৎকালীন ধর্মীয় বিভিন্ন বই সংরক্ষণ এবং তার কপি করা পবিত্রতা রক্ষা করার প্রথম শর্ত হিসেবে এই পাণ্ডুলিপিগুলো তৈরি করা হতো (সূত্র : Encyclopedia Britannica)।

২. পাফিন বুকস (Puffin Books) : শিশুদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিত্রসমৃদ্ধ প্রাথমিক ধারণামূলক বইয়ের সিরিজ। ইংরেজ বুক ডিজাইনার, সম্পাদক এবং প্রকাশক নোয়েল ক্যারিংটনের চিন্তার ফসল হিসেবে এই বইয়ের প্রথম চারটি খণ্ড ১৯৪০ সালে প্রকাশক অ্যালেন লেনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ২৫ বছরে মোট ১২০টি বই প্রকাশিত হয়। এই সিরিজ দিয়েই যাত্রা শুরু হয় পেঙ্গুইন-এর ছোটোদের প্রকাশনা 'পাফিন পিকচার বুকস'-এর। বইগুলোর মূল কাগজের একপিঠ ছাপা হতো রঙিন, অন্য পিঠ সাদা-কালো রঙে (আশিস, ২০১৫ ; সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৭৮)।

৩. ঠাকুমা'র ঝুলি : বাংলার লোকমুখে প্রচলিত রূপকথা। লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা মানুষের মুখে শুনে শুনে ও গ্রামবাংলায় ঘুরে ঘুরে এসব লোককাহিনি সংগ্রহ করেন। এমনকি বৃদ্ধাদের ফোকলা দাঁতের জন্য জড়িয়ে যাওয়া কথাকেও তিনি ফনোগ্রাফের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করে নিতেন। তারপর সেই রেকর্ড বারবার বাজিয়ে তা থেকে সঠিক কাহিনি বুঝে নিয়ে নিজস্ব লেখন-রীতি অনুসারে সাহিত্য রূপ দেন। ১৯০৭ সালে তিনি লোকগীতিকা সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যে সেকালের কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশক ভট্টাচার্য অ্যান্ড সন্স থেকে এগুলোকে 'ঠাকুমা'র ঝুলি নামে বই আকারে প্রকাশ করেন। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'ডালিম কুমার', 'নীলকমল আর লালকমল' উক্ত বইয়ের কিছু নমুনা গল্প (বিশ্বজিৎ, ২০০৭ ; সূত্র : ভদ্রেশু, ২০১৭ : ৭৯)।

তথ্যসূত্র

অশোক উপাধ্যায় (২০১৩)। 'অন্নদামঙ্গল'। ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, চার্বাক, পৃ. ২০৯। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

আশিস পাঠক (২০১৫)। পাফিন পিকচার বুক। ১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা,

চার্বাক, পৃ. ১০৯-১১৩। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) (২০০৭)। ঠাকুরমা'র ঝুলি, (শতবার্ষিক সংস্করণ)। অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

শাওন আকন্দ, সম্পা. লালা রুখ সেলিম (২০০৭)। গ্রাফিক ডিজাইন : গ্রন্থ-নকশা, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। চারু ও কারুকলা। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ভদ্রেশু রীটা (২০১৭)। "শিশুর সংজ্ঞাপন-দক্ষতা অর্জনে চিত্রসমৃদ্ধ শিশুতোষ গ্রন্থের ভূমিকা"। ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা। বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Brainerd, C. J. (1996). "Piaget: A centernnial celebration". Psychological Science, 7, 191-225

Bremner, J. G. (2001). Cognitive development: Knowledge of the physical world. In J.

G. Bremner & A. Fogel (Eds.), Blackwell handbook of infant development (pp. 99-138). Malden, MA: Blackwell.

Chris Russell (2016). “A Brief History of Book Illustration”. Lhttps://lithub.com/a-brief-history-of-book-illustration/

DeLoache, J. S., Strauss, M. S., & Maynard, J. (1979). Picture perception in infancy. Infant Behavior and Development, 2, 77-89.

Joshua J. Mark (2018). “Illuminated Manuscripts”. Ancient History Encyclopedia.

Kümmerling-Meibauer, B. (Ed.). (2011). Emergent literacy: children’s books from 0 to 3 (Vol. 13). John Benjamins Publishing.

বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদসৃজনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অঙ্কনশৈলী

ড. মলয় বালা*

সারসংক্ষেপ : প্রচ্ছদ অঙ্কনে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪) কিংবদন্তিতুল্য। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রণীত অসংখ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন। অধিকাংশ গ্রন্থের প্রচ্ছদেই তাঁর হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। যা প্রতিকৃতিপ্রধান চিত্রকলা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক-গবেষকদের বৈচিত্র্যময় বিষয় বর্ণনার সঙ্গে সুসংগতিপূর্ণ আবক্ষ প্রতিকৃতি, নিজস্ব ঢঙের ক্যালিগ্রাফি, নকশা ও রং বিন্যাসে স্বতন্ত্র ভঙ্গি তাঁর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদকে দিয়েছে অনন্য শিল্পমাত্রা। এযাবৎকালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুবিষয়ক দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর করা প্রচ্ছদ মৌলিকতা ও নান্দনিকতায় অনন্য। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে বাঙালির জাতিসত্তা, আত্মপরিচয়, জেগে ওঠার শক্তি তিনি সর্বজনীন করেছেন এবং প্রচ্ছদের ছদ্মবেশে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলা পৌঁছে গেছে আমজনতার কাছে।

এ দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী এবং প্রচ্ছদ শিল্পের কিংবদন্তি নাম কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪)। প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদ, সচিত্রকরণ, অলংকরণ, নামলিপি, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি শিল্পকর্মে তিনি ছিলেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রিক। পঞ্চাশের দশকে জ্যামিতিক রূপবন্ধে দেশজ মোটিফের ব্যবহারে সমকালীন চিত্রজগতে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব পরিচয়।[১] 'প্রচ্ছদশিল্পের নকশাগুণ এসেছে তাঁর চিত্রশিল্পে আবার চিত্রশিল্পের চিত্রগুণ সমৃদ্ধ করেছে তাঁর প্রচ্ছদশিল্পকে।'[২] জীবদ্দশায় ছয় দশকের অধিককাল তিনি প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পকে বিপুল ও বিচিত্রভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।[৩] অর্থাৎ পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করে গেছেন।[৪] আশি-ঊর্ধ্ব বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বত্রগামী, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, জাতির কুলপতি, ভরসার জায়গা।[৫]

---

* অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য, সংগীত ও চলচ্চিত্র অনুরাগী এই শিল্পীর প্রচ্ছদ চিত্র সংগীতের মতোই সরল ও সুরেলা। প্রকাশনা শিল্পের অহংকার এই শিল্পী তাঁর কাজ দিয়ে রসিকদের মন রাঙিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শিল্পচিন্তায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদশিল্পে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরেছেন সুউচ্চ শিখরে। বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের যত প্রচ্ছদ করেছেন তার অধিকাংশেই হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। প্রতিকৃতি-প্রধান অলংকরণের অনন্য দৃষ্টান্ত সাহিত্য সাময়িকীর বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায়। এসব প্রতিকৃতি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকর্ম হিসেবেও অতুলনীয়। নাসির আলী মামুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমার বইয়ের কভার ইলাস্ট্রেশন বা পেইন্টিং এগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। আমি আমার ছবিকে বইয়ের প্রচ্ছদে নিয়ে এসেছি, বইয়ের প্রচ্ছদকে ছবিতে নিয়ে এসেছি।'[৬] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যথার্থই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'জীবনে তিনি যেরকম একটি প্রসন্নতা ধরে রাখতেন; কথাবার্তা, চালচলনে পরিচ্ছন্ন একটা ভাব বজায় রাখতেন, ছবিতেও তাই'[৭]। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মূল্যায়ন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

বাবার চাকরিসূত্রে কাইয়ুম চৌধুরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলজীবনে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করেছেন। তখনই বিভিন্ন গুণিজনের সান্নিধ্যে ডিজাইনবোধ ও মুদ্রণ-সৌকর্য সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়েছিল।[৮] আর্ট ইনস্টিটিউটের (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র এই শিল্পী ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে একাত্ম থেকেছেন। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে পোস্টার এঁকেছেন।[৯] উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গঠিত চারু ও কারুশিল্পীদের সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য তাঁর অবস্থান ছিল সর্বদাই সম্মুখ সারিতে।[১০] স্বাধীনতা-পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ Meet Bangladesh গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন। সহযোগী শিল্পীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কাজের সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করেছেন।[১১] '৭৫-এর শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের পর বিবেকের দায়িত্ব থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্যানভাসে স্থাপন করে একাধিক ছবি এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী।'[১২] সামরিক শাসনামলে একুশে পদক সামরিক

পোশাক পরা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গ্রহণ করেননি।[১৩] চারুকলার শিক্ষার্থীরা যখন দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন করেছেন, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সেখানে শিল্পকর্ম প্রদান করে তাঁদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। 'প্রথম আলো' পত্রিকায় দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করায় একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছেন প্রচ্ছদশিল্পী মাসুক হেলাল। তিনি কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিকৃতি অঙ্কনশৈলী দ্বারা প্রভাবিত। যা মাসুক হেলালের আঁকা বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতি ও কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ প্রতিকৃতির শৈলীগত সাদৃশ্য দেখেও অনুধাবন করা যায়। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও প্রচ্ছদে হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। মাসুক হেলালের প্রত্যবেক্ষণ হচ্ছে, কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর হাতে আঁকা প্রতিকৃতি ব্যবহার শুরু করেছেন।[১৪]

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক অসংখ্য প্রচ্ছদ রয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করলে শিল্পীর অঙ্কনশৈলীর স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে।

চিত্র-১ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রন্থের প্রচ্ছদ (আগামী প্রকাশনীর এই প্রচ্ছদটি চতুর্থ সংস্করণ ২০০২ থেকে নেওয়া।
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৪)

চিত্র-২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম গ্রন্থের প্রচ্ছদ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯ থেকে নেওয়া)

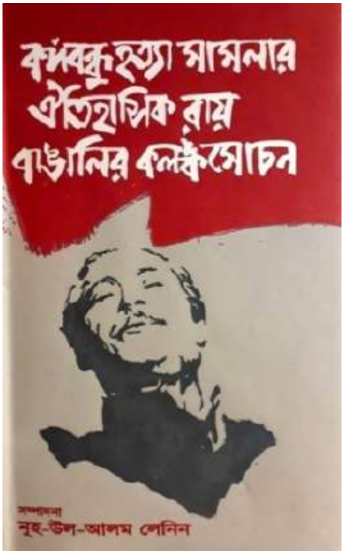

চিত্র-৩ : নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙালির কলঙ্কমোচন গ্রন্থের প্রচ্ছদ

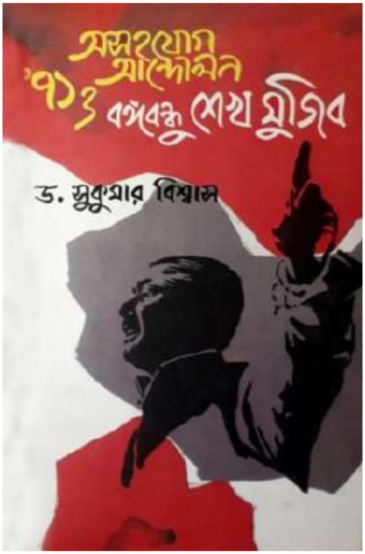

চিত্র-৪ : অসহযোগ আন্দোলন ৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৭ থেকে নেয়া

আগামী প্রকাশনীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব[১৫], গ্রন্থের প্রচ্ছদে সীমিত লাইনে বঙ্গবন্ধুর হাসিযুক্ত প্রতিকৃতি তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম। তুলির সরু-মোটা রেখা চোখ, মুখ ও থুতনির উত্তল অবতল অবস্থাকে বাস্তবানুগ ইল্যুয়েশন দিয়েছে। হাতে লেখা ক্যালিগ্রাফিতে (চিত্র-১) গ্রন্থ-শিরোনাম এবং অঙ্কিত প্রতিকৃতি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নান্দনিক রূপ লাভ করেছ। সাদাকালো রেখার এই চিত্রের মতো সাদা-কালোর বিভাজনে বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়ব দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম[১৬] গ্রন্থে। তুলি-কালির আলোছায়া ধরে মুখাকৃতির ত্রিমাত্রিক আদল বুঝতেও অসুবিধা হয় না (চিত্র-২)। তুলি-কালিতে একই ঘরানার প্রতিকৃতির আরও কয়েকটি গ্রন্থের উদাহরণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় : বাঙালির কলঙ্কমোচন[১৭] (চিত্র-৩), অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব[১৮] (চিত্র-৪) ও মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড[১৯] (চিত্র-৫)। এসব প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুর মুখাকৃতির ভঙ্গিতে নান্দনিকতা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রতিকৃতির ভাব-ভাবনা প্রকাশের স্পষ্টতা লক্ষ করার মতো। অর্থাৎ অভিব্যক্তির মধ্যে গ্রন্থ শিরোনামের সার্থক সামঞ্জস্যতা পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রচ্ছদ কিংবা চিত্রাঙ্কনে কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন সত্যিকারের সাধক। শিল্পকে সাধনার মতোই দেখতেন। সফলভাবে প্রতিটি প্রচ্ছদ করার জন্য যত্নের ঘাটতি ছিল না। বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর কাজের প্রক্রিয়া হদিস করলে। কারণ প্রতিটা কাজের জন্যই তিনি একাধিক লে-আউট করে নিতেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি করার জন্য তিনি কালি-তুলিতে একাধিক লে-আউট করে নিতেন। তারপর সেখান থেকে নির্বাচিত প্রতিকৃতি প্রচ্ছদের রূপকল্পনা অনুযায়ী ছাপা উপযোগী রঙে প্রস্তুত করে নিতেন।[২০] উল্লেখ্য শিল্পীপুত্র মইনুল ইসলাম জাবের খুব কাছে থেকে এসব প্রতিকৃতি অঙ্কন দেখেছেন এবং অনেকগুলো লে-আউট তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ছোটো আকৃতির এসব লে-আউট প্রচ্ছদে কিছু নোটও লেখা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের[২১] প্রচ্ছদ (চিত্র-৬) ও মইনুল ইসলাম জাবেরের সংগ্রহের লে-আউট (চিত্র-৭) পাশাপাশি রেখে দেখলে

চিত্র-৫ : মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৬ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৭ : কালি-তুলিতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি (লে-আউট)

বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু একাধারে বহুধা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কখনো আপসহীন রাজনীতিবিদ, কখনো বলিষ্ঠ নেতা, কখনো নেতৃত্বের জাদুকর, কখনো অতি সাধারণ মানুষ, কারো ভাই, কারো পিতা। সুতরাং লেখক-গবেষকগণ অসংখ্য

চিত্র-৮ : বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব গ্রন্থের প্রচ্ছদ

চিত্র-৯ : মুজিব ভাই গ্রন্থের প্রচ্ছদ

দৃষ্টিকোণ থেকে অসংখ্য বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী লেখকদের সেই বৈচিত্র্যময় বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রচ্ছদের জন্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন। উদাহরণ হিসেবে বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব[২২] ও মুজিব ভাই[২৩] গ্রন্থের প্রতিকৃতির আদল তুলনা করে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব গ্রন্থের প্রচ্ছদে (চিত্র-৮) একজন নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অবিচল লক্ষ্য পাশ ফেরা প্রতিকৃতির অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। আবার তিনি যখন কারো একান্ত কাছের মানুষ কারো ভাই তখন তাঁর রূপ নিশ্চয়ই আলাদা। মুজিব ভাই গ্রন্থের হাসিযুক্ত প্রতিকৃতি দিয়ে সেই রূপটি যেন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (চিত্র-৯)। এখানেই তাঁর প্রতিকৃতি দিয়ে প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনের বিশেষ কৃতিত্ব। কোনো কোনো প্রচ্ছদে গ্রন্থের বিষয় বর্ণনে ভাব-ভঙ্গি, আকার-ইঙ্গিত, প্রতীক জোরালো ভূমিকা রেখেছে। যেমন স্বাধীনতার স্থপতি [২৪] গ্রন্থে নামের সঙ্গে সংগতি রেখে স্তম্ভ দিয়েছেন, সমকালে শ্রদ্ধা ও স্মরণ দেখাতে প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আবক্ষ প্রতিকৃতির ভাস্কর্য-আদল এনেছেন (চিত্র-১০)।

আকার-ইঙ্গিতে ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকের এই প্রচ্ছদে কম্পিউটার গ্রাফিক্স মূলত প্রযুক্তি ব্যবহারেরও উদাহরণ। এরকম আরও একটি ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকের প্রচ্ছদ হচ্ছে ইতিহাসের রক্ত পলাশ পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর[২৫] গ্রন্থের প্রচ্ছদ। রক্তস্নাত ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু শুয়ে থাকা নিথর দেহের একাংশ দেখা যায় এই প্রচ্ছদচিত্রে (চিত্র-১১)। মোটকথা প্রতিটি প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একাধিক খণ্ডের সুন্দর প্রচ্ছদচিত্রের উদাহরণ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড[২৬] (চিত্র-১২) ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে দুটি রঙে জমিন বিভাজন করে দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস করেছেন। অধিকাংশ গবেষকই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে অভিন্ন করে মূল্যায়ন করেন। কাইয়ুম চৌধুরী বর্ণনাধর্মী শিল্পভাষায় এই অভিন্নতা দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিত্রটিতে। আবহমান বাংলার নৈসর্গিক ফর্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ফর্ম যুক্ত করে তিনি মোক্ষে পৌঁছেছেন। ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় বাংলার প্রতিচ্ছবি। আর তার মধ্যে রোমান্টিক বর্ণাবেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম চিত্রটির পরিশীলিত চিত্র আঙ্গিক, কম্পোজিশনের অসামান্য ভারসাম্য, যথার্থ নামকরণ উল্লেখ করে মনে দাগ কাটার মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৭] মূলত বঙ্গবন্ধু ও বাংলার সবুজাভাব উজ্জ্বল নিসর্গের মেলবন্ধন হয়েছে এই চিত্রে। আর এই চিত্র দিয়ে অপূর্বভাবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমার ভালোবাসার দেশ[২৮] গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন (চিত্র-১৩)। সত্যিকার অর্থে এই অসামান্য চিত্রটি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক যেকোনো প্রকাশনার জন্যই প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ শিল্প-সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকী 'দেশ প্রসঙ্গ'র 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' সংখ্যার (দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫) প্রচ্ছদের তাৎপর্য দিয়ে বিচার করা যায়।

কাইয়ুম চৌধুরীর হস্তাক্ষর শৈলী, তাঁর প্রচ্ছদ অঙ্কনকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা। তাঁর হস্তাক্ষরের বিশেষত্বের কারণে মার্কিন-সুইডিশ টাইপ ডিজাইনার জেকব টমাস কাইয়ুম চৌধুরীর হস্তাক্ষরে প্রথম আলোর জন্য তৈরি করছেন অনন্য টাইপফেস কাইয়ুম ফন্ট।[২৯] শিল্পী রফিকুন নবী লিখেছেন, 'তার প্রচ্ছদের ক্যালিগ্রাফি, নকশা এবং রং বিন্যাসের গ্রাফিকশৈলী এতটাই ব্যতিক্রমী যে, দেশের সব প্রকাশক-লেখকের পক্ষে তাঁর কাজকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা কঠিন ছিল।'[৩০] প্রচ্ছদে তিনি অনবরত স্টাইল পরিবর্তন করলেও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক প্রচ্ছদের কেন্দ্রে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। ব্যক্তিত্বের

অভিব্যক্তি দিয়ে গ্রন্থের অন্তর্গত ভাব প্রচ্ছদে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অবদান রশীদ আমিনের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন রুচির দৈন্যের বিরুদ্ধে যে-সুরুচির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তার একজন অগ্রদূত ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।...তাঁর অঙ্কিত প্রচ্ছদ, পোস্টার, অলংকরণ আমাদের দেশের ব্যাপক আমজনতার শিল্পের ক্ষুধা মিটিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাঁকে গণশিল্পীর অভিধায়ও অভিষিক্ত করা যায়। তবে কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদকে শুধু মামুলি গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে ধরা যাবে না, বরং তা একেকটি চিত্রকর্ম। তিনি গ্রাফিক ডিজাইন ও চিত্রকর্মকে একাকার করে দিয়েছেন, এখানে বোধহয় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সার্থকতা।[৩১]

উল্লিখিত আলোচনা ও রশীদ আমিনের মূল্যায়নের সূত্র ধরে কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিটি প্রচ্ছদচিত্রকে একেকটি বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলার সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এ যেন প্রচ্ছদের ছদ্মবেশে বঙ্গবন্ধুবিষয়ক চিত্রকলা পৌঁছে গেছে আমজনতার কাজে।

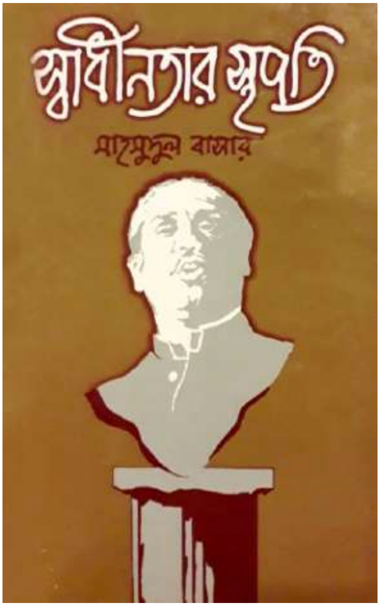

চিত্র-১০ : স্বাধীনতার স্থপতি গ্রন্থের প্রচ্ছদ

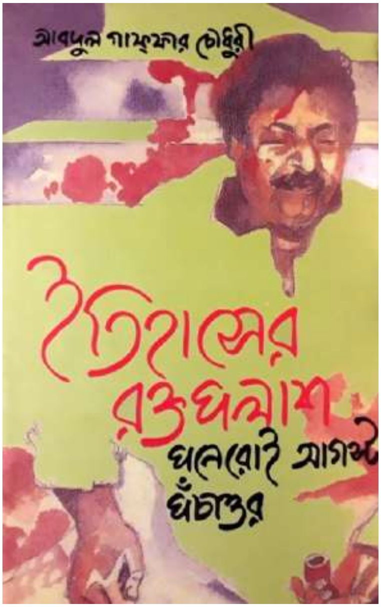

চিত্র-১১ : ইতিহাসের রক্তপলাশ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

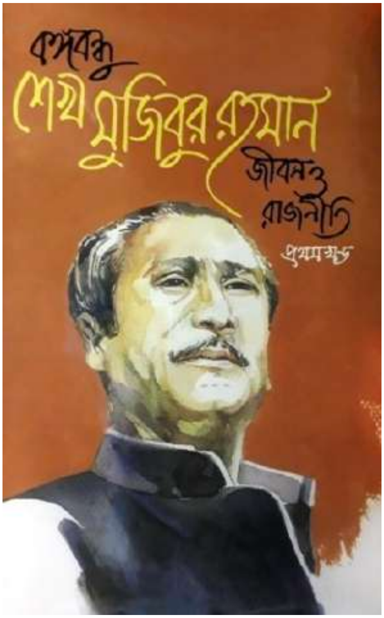

চিত্র-১২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) প্রচ্ছদ

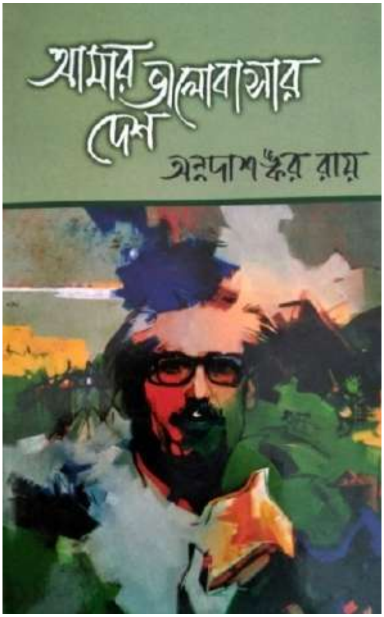

চিত্র-১৩ : আমার ভালোবাসার দেশ গ্রন্থের প্রচ্ছদ

ছবি বা প্রচ্ছদ সৃষ্টির আগে তিনি ছোটো ছোটো কাগজে সাদাকালোয় একাধিক খসড়া বা চর্চাচিত্র করতেন। সাদাকালোয় করা এসব চর্চাচিত্রে পরিমিত উচ্চারণ, শীলিত অভিব্যক্তি হলেও তাঁর ছবিতে সবসময় রঙের উচ্চকিত মেলবন্ধন চোখে পড়ার মতো। মিজারুল কায়েসের মতে, কাইয়ুম চৌধুরীর ছবি কবিতার মতো পাঠ করা যায়।[৩২] এই ব্যাখ্যা তাঁর বঙ্গবন্ধুবিষয়ক প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রচ্ছদে প্রতিকৃতি ক্যালিগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফির জন্য পটভূমি বিভাজনের সারল্য ও গতিময়তা ‘ছড়া’র সঙ্গে তুলনীয়। সাহিত্য অনুরাগী এই শিল্পী ছড়া লিখেছেন, প্রকাশিত দুটি ছড়াগ্রন্থ রয়েছে। হয়তো এই ছন্দবোধ নিশ্চয়ই তাঁর চরিত্র চিত্রণে ছায়া রেখেছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও মুদ্রণ টেকনিকের পরিবর্তনে যেভাবেই তিনি বঙ্গবন্ধুর উপস্থাপন করেছেন না কেন সেখানে তাঁর সৃষ্টিশীলতার কমতি ছিল না। বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গ্রন্থের অধিকাংশ প্রচ্ছদ ইলাস্ট্রেটিভ আঙ্গিকে করা। গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর যে বিষয়ভাবনা প্রকাশিত

হয়েছে তা অঙ্কিত প্রতিকৃতিতে দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফিক বা লিপিমালা এবং টাইপোগ্রাফি বা হরফশিল্পের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। বলা যায়, প্রকাশনাশিল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে জাতিসত্তা, আত্মপরিচয়, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির জেগে ওঠার শক্তি সর্বজনীন করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল মনসুর, "আমার কাইয়ুম স্যার", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), একাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৮

২. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরী : এক বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবন", নান্দীপাঠ, সংখ্যা ৮, জুন ২০১৯, পৃ. ৪১০

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত

৪. মামুন কায়সার, "আমার গুরু কাইয়ুম চৌধুরী", দেশ প্রসঙ্গ (বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৬

৫. আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত

৬. নাসির আলী মামুন, "কাইয়ুম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার : ঐতিহ্য ঠিকানা", ভিন্নচোখ, শিল্প ও শিল্পী সংখ্যা, পৃ. ১৪৩

৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, "কাইয়ুম চৌধুরী : ফিরে দেখা", সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১২১

৮. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরীর নান্দনিকতা", দেশ প্রসঙ্গ (বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), পৃ. ৬

৯. আনিসুজ্জামান, "কাইয়ুম চৌধুরী : মানুষ ও শিল্পী", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১০. সৈয়দ আজিজুল হক, "কাইয়ুম চৌধুরী : এক বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবন", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

১১. শিল্পী রফিকুন নবীর সঙ্গে মুঠোফোনালাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ১৫ই অক্টোবর, ২০২০

১২. দেবব্রত চক্রবর্তী, "কাইয়ুম চৌধুরী", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৩. মইনুল ইসলাম জাবের, "আমার বাবার মুখ", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৪. শিল্পী মাসুক হেলালের সাক্ষাৎকার, ২৩শে নভেম্বর, ২০২০

১৫. মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, জুলাই ২০০২ [প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৪]

১৬. জিল্লুর রহমান খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১৯ [প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৪]

১৭. নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় বাঙালির কলঙ্কমোচন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রকাশক : তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ২০১২ [প্রথম প্রকাশ : পয়লা বৈশাখ ১৪১৭]

১৮. সুকুমার বিশ্বাস, অসহযোগ আন্দোলন-৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ [দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০১৭]

১৯. মিজানুর রহমান খান, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকান্ড, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, আগস্ট ২০১৩

২০. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর পুত্র মইনুল ইসলাম জাবেরের সঙ্গে মুঠোফোনালাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ : ১০ই জানুয়ারি ২০২১

২১. শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ (সম্পা.), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ [তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি : ২০২০]

২২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

২৩. এবিএম মূসা, মুজিব ভাই, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, মার্চ ২০২০ [প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১২]

২৪. মাহমুদুল বাসার, স্বাধীনতার স্থপতি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০১

২৫. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ইতিহাসের রক্তপলাশ, আগামী সংস্করণ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, জুলাই ২০১৭ [প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪]

২৬. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, দ্বিতীয় খণ্ড

২৭. নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু : শিল্পীর চোখে, দেশ প্রসঙ্গ (মুজিব শতবর্ষ সংখ্যা) অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০, পৃ. ৪৫

২৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, আমার ভালোবাসার দেশ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

২৯. https://www.prothomalo.com/onnoalo/কাইয়ুম-চৌধুরীর-অমর-হরফ (ব্রাউজিংয়ের তারিখ : ১৫ই জানুয়ারি ২০২১)

৩০. রফিকুন নবী "রুচিশীল মানুষের প্রয়াণ", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩১. রশীদ আমিন, "আমাদের সুরুচির বরপুত্র", কালি ও কলম (কাইয়ুম চৌধুরী সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৩২. মিজারুল কায়েস, "কাইয়ুম চৌধুরী : ঠিকানার জয়গান", শিল্পরূপ, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪, পৃ. ৫৯

বিজ্ঞাপন প্রচারে গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিকতা

ড. সীমা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ : বিজ্ঞাপন বলতে আধুনিক কালের একটি বহুল ব্যবহৃত বিপণন কৌশল যার মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যের গুণাবলী ও পণ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ভোক্তাদের অবহিত করা। বিজ্ঞাপন একটি নিপুণ শিল্পশৈলী। সাধারণ অর্থে পণ্যদ্রব্যের পরিচিতি ও বেচাকেনার জন্য খরিদদারদের আকর্ষণ করার ব্যবসায়িক কৌশল বা আর্ট। ক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্য সম্পর্কে পণ্যের গুণাগুণ জানানো এবং পণ্য কেনার জন্য প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ভাড়া করা জায়গায় ছাপানো বা প্রচার মাধ্যমে সংবাদ ছড়ানোর নাম বিজ্ঞাপন। তার শুরু হতে পারে দেয়াললিখন, হ্যান্ডবিল ও পোস্টারের মাধ্যমে। একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে বিজ্ঞাপনের নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে অকল্পনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মধ্যে গ্রাফিক ডিজাইন অন্যতম। সৃষ্টিশীল মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞাপনের যে নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ হয়েছে তা গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমেই। গ্রাফিক ডিজাইন পণ্য প্রচারের সম্ভাবনা ও পণ্যের প্রয়োগ যোগ্যতা নান্দনিকতার দিক দিয়ে অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ভোক্তার চাহিদা, রুচি ও প্রয়োজনীয় পণ্যটিকে বাজারে টিকিয়ে রাখার জন্য পণ্যের যৌক্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্যটিকে উপস্থাপন করা হয়। মডেল ও পণ্যের সমন্বয়ে প্রথাগত নির্মাণ উপকরণ সাধারণ মানুষকে সৃজনশীল রূপরেখায় সুন্দরভাবে পরিচালিত করছে। বিজ্ঞাপনে নানা পণ্যের দৃশ্যে বা টিভিসিতে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সৌন্দর্যের উপস্থাপন। গ্রাফিক ডিজাইনের নির্মাণ সুবিধায় বিজ্ঞাপনের ফাইনাল আউটপুট থেকে ফাইনালাইজড করার পূর্বে ভিজুয়েলাইজেশন, মডিফিকেশন ইত্যাদি করার

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতায় বহু পরিবর্তন এসেছে। গ্রাফিক ডিজাইন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে বিজ্ঞাপন তৈরিতে যে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা এসেছে তা হলো বিজ্ঞাপন প্রচারের মানগত নান্দনিক উপস্থাপন।

মানুষের রুচির মধ্যে কোনো অ-নান্দনিক মূল্যবোধ নেই; মানুষ নান্দনিক অর্থে নিরপেক্ষ। আর সুন্দর ও প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারলে পরিলক্ষিত হবে রুচির পরিবর্তন। সেক্ষেত্রে পণ্যের ব্যবহার ও তার প্রচারণায় বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে তৈরি বিজ্ঞাপনগুলো যুক্তিশাস্ত্রের মতো কাজ করে। মানুষের মাঝে চাহিদা ও প্রয়োজনের মাঝপথে পণ্য শৈল্পিকভাবে বাণিজ্য করছে আর সেটা টিকিয়ে রেখেছে পণ্যের নান্দনিক উপস্থাপন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় সময়ের বস্তুগত পরিবর্তনে আর পণ্যের উন্নয়ন হয় প্রচারণাতে। প্রযুক্তির ক্রমোন্নতি আজ পাথর খোদাই থেকে ইলেকট্রনিক প্রিন্টে পৌঁছে গিয়েছে। এখন স্ক্রিনে দেখানো হয় উৎপাদিত পণ্যের চলমান প্রচার। পণ্য থেকে শুরু করে সকল পণ্য উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের লোগো, ব্রোশিওর, বিজনেস কার্ড কিংবা ওয়েবসাইটগুলো মানুষের সচেতনতায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। একজন ডিজাইনারকে প্রথমে কোম্পানি বা ব্র্যান্ডের পণ্য ও প্রচারণার মূল বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জানা থাকতে হয়। তারপর সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন করতে হয়। তবে ধারণা যেন গতানুগতিক না হয়, সৃজনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ পণ্য মানুষকে রুচিশীল করে তোলে। যেকোনো ব্র্যান্ডের পণ্য প্রচারে বা বিজ্ঞাপনে ডিজাইন সচেতনতা থাকা খুবই জরুরি। না হলে ব্র্যান্ডের ডিজাইনারদের একটু ত্রুটি যেকোনো পণ্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেবে। এক্ষেত্রে পণ্যের ডিজাইন ক্রেতার প্রয়োজনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে। সামগ্রিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ও গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে। যেমন–পণ্য প্রচারে গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিক ব্যবহার, পণ্য প্রচারে বিভিন্ন মাধ্যমের অবদান এবং সেসব পণ্যের বিচার-বিশ্লেষণ। বিজ্ঞাপন শিল্পের গোড়ার কথা ধরা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপে। যখন ১১৪১ সালে ফ্রান্সের বৈরী শহরে চিৎকার করে পণ্যদ্রব্যের কথা ঘোষণা করা হতো। বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িক কল্যাণে নিয়োজিত একটি প্রচার কার্যক্রম। কাজেই সমাজের বসবাসরত ক্রেতাদের অধিক সেবার প্রচার-প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপনের নান্দনিকতা অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে পণ্য বেচাকেনার

জন্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। সেই শহরে ১২জনের একটি দল ছিল তাঁরা সেই বৈরী শহরের উৎপাদিত পণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল। আবার ১৪৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপার যন্ত্র আবিষ্কারের পর নানান রূপে পণ্যের প্রচার শুরু হয়। তখন লিথোগ্রাফি ব্যবহার করে আধুনিক জগতে যিনি প্রথম রঙিন আর্ট পোস্টার বা বিজ্ঞাপন শিল্প সৃষ্টি করেন তিনি হলেন ফরাসি চিত্রশিল্পী জুলেসেরে (মোজাহারুল হক, ১৯৮৪ : ৩-৪)। বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রেরও একটি অংশ হয়ে উঠে, পণ্য প্রচারের সাথে সাথে। সে সময় কিছু বহুল প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন ছাপানো হতো লেটার প্রেসের মাধ্যমে। সেসব সাময়িকীগুলোতে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে গ্রাফিক ডিজাইনের কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যেত। ফলে ১৯৭৫-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের গতানুগতিক সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। যেমন–স্ক্রিনকে এড়িয়ে লাইনের কাজ করার একটি প্রবণতা ছিল। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৭ সালের পর সীমাবদ্ধতা কিছুটা কাটিয়ে ’৮০-এর দশকে গ্রাফিক ডিজাইন তথা বিজ্ঞাপন শিল্প আন্তর্জাতিকতার স্রোতের ধারার সাথে মিলে ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষ অর্জন করতে থাকে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতির দিকে তাকালে বোঝা যায় গ্রাফিক ডিজাইনের গুরুত্বটুকু। বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকালে লক্ষ করা যায় ’৭০-এর দশকের পরের বিজ্ঞাপনগুলিতে যে লাইন ব্যবহার বা মোটা কাজের প্রবণতা ছিল তা ’৮০-এর দশকে এসে নতুন নতুন আইডিয়া সৃষ্টি করেছে সৃজনশীলতার সমন্বয়ে। কম্পিউটার গ্রাফিক্স আসার পর থেকেই একটু জটিল প্রক্রিয়া অর্থাৎ স্ক্রিন-এর ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বাড়ে। বর্তমানে একজন ডিজাইনার কালি-কলম-পেন্সিল, রংতুলি ছাড়াই তাঁর ডিজাইন ভাবনাটিকে কম্পিউটারে নিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে ইচ্ছামতো প্রণয়ন করতে পারছেন। ফলে ডিজাইনগুলো হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক মানের। পূর্বে বিজ্ঞাপন শিল্পে বিশেষ প্রেস লে-আউটে টাইপোগ্রাফি থেকে শুরু করে ইলাস্ট্রেশন পর্যন্ত শিল্পীরা নিজেদের হাতেই করতেন। ফটোগ্রাফির ব্যবহার খুব একটা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাখন দত্ত গুপ্ত চিত্রিত ইন্ডিয়ান টি-বোর্ডের দৈনিক প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সিরিজের বিজ্ঞাপনের কথা বলতে পারি। এদিকে তীব্র জাতীয়তাবোধে তাড়িত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে আরও

বাড়িয়ে তুলেছিল। যা ছিল তৎকালীন ইসলামিক এবং বর্তমান সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক নীরব আন্দোলন। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে আমরা উন্নত দেশের তুলনায় এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এর কারণ আমাদের মাঝে একাডেমিক কিংবা আর্টিস্টিক কোয়ালিফিকেশনের সন্নিবেশ খুবই সামান্য। এক সময় গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে খুব কম লোকেরই ধারণা ছিল। গ্রাফিক ডিজাইন কথাটি গুটিকয়েক শব্দের মধ্যে দেখা গেলেও এর ব্যবহারিক দিক অনেক বেশি। GRAPHIC শব্দটি ইংরেজি শব্দ হলেও এটি GRAPHIK জার্মান শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ ড্রইং বা রেখা। ড্রইং থেকে ছাপা পর্যন্ত প্রচারের সকল কাজ গ্রাফিক্সে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেসব চিত্রের সমাপ্তিকরণ ড্রইংয়ের উপর নির্ভরশীল সেসব চিত্রসমূহকে বুঝায়। সাধারণত ড্রইং, ছবি বা কোনো অক্ষর শিল্পই হচ্ছে GRAPHIC DESIGN। বাংলাদেশে গ্রাফিক ডিজাইনের যাত্রা শুরু মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই। বিলাত থেকে ইংরেজদের সস্তায় নিয়ে আসা প্রিন্ট দিয়েই ধরতে গেলে এ মাধ্যমটির যাত্রা শুরু। অন্নদা মুন্সী, সত্যজিৎ রায়, মাখন দত্ত গুপ্ত, এ সি গাঙ্গুলী– তারা ছিলেন সর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রাফিক ডিজাইনার।

গ্রাফিক ডিজাইন কথাটির সাথে বাণিজ্যের একটি সরাসরি যোগাযোগ আছে যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়টি প্রচারের পাশাপাশি শুধু ব্যবসায়িক দিক নিয়ে কাজ করে তা নয়; বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যবহারিক সবকিছুরই মাঝে এর বিচরণ। মোট কথা ব্যবহারিক দিক থেকে গ্রাফিক ডিজাইন সবকিছুরই নান্দনিক উপস্থাপনের অন্তর্গত। এছাড়া গ্রাফিক ডিজাইনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন– ১. লোগো বা মনোগ্রাম, পিকটোগ্রাম, ২. টাইপোগ্রাফি, ক্যালিগ্রাফি, ৩. পোস্টার, শো-কার্ড, বিলবোর্ড, ৪. বইয়ের প্রচ্ছদ, পত্রিকার ফিচার পেইজ, ওয়েব পেইজ, ৫. ইলাস্ট্রেশন, ড্রইং, কার্টুন, ডিজাইন, গ্রাফিক্স, ৬. বিজ্ঞাপন, লিফলেট, ফোল্ডার, টিভি টেলপ, ৭. প্যাকেজিং, হ্যাংগিং ফেস্টুন, ৮. স্ট্যাম্প, বন্ড, কারেন্সি নোট, ৯. ক্যালেন্ডার, ম্যাপ, গ্রাফ চার্ট, ১০. অ্যানিমেশন ইত্যাদি। নতুন উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে সকলের আকর্ষণ সৃষ্টি করা থেকে শুরু করে পণ্যের গুণাগুণসহ তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মানুষের জীবনে সেই পণ্যের গুরুত্ব কতটুকু সেটাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বিজ্ঞাপনকে বলা হয় বাণিজ্যের প্রসাধন। বর্তমানে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্যের

ক্যাম্পেইন করা হয়। প্রচার যখন নান্দনিক হয়ে উঠে তখন তা শিল্পে পরিণত হয়। যা পণ্যের বাজার বিভাজিত করে শ্রেণিকরণের পাশাপাশি উচ্চশ্রেণির শিল্পে তার প্রভাব দেখা যায়। গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্য প্রচারে প্রাকৃতিক উপাদান বা যেকোনো দৃশ্য অস্থায়ী শিল্প উপাদান বলে মনে হয়। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাফিক ডিজাইনের ক্রমশ উন্নতি দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

বিশ শতকের সত্তর দশকে শিল্পের একটি নতুন ধারকরূপে সূচিত হয়েছে আজকের এই গ্রাফিক ডিজাইন। প্রচারের অন্তর্গত শিল্পের অনেক উপাদানকে পরিত্যাগ করে প্রচলিত শিল্পধারার বিরুদ্ধে গ্রাফিক ডিজাইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–ভোক্তার চিন্তা-চেতনার সংমিশ্রণ। গ্রাফিক ডিজাইন বিজ্ঞাপনের ক্রিয়াকর্মে একধরনের নান্দনিক শিল্পকে উপস্থাপনের চেষ্টা করে।

> শিল্প বলতে আমরা সচরাচর চারুশিল্প কখনও বা কারুশিল্পকে বুঝি। মানুষের জীবনে আনন্দ ও প্রয়োজন দুইয়েরই সমান স্থান এবং সমান মূল্য। যে মানুষ প্রয়োজন বুঝে না, কেবল আনন্দ চায়, তাকে আমরা পাগল বলি; আবার যে, জীবনে আনন্দ ও হাসিকে বাদ দিয়ে কেবল প্রয়োজন নিয়ে থাকতে চায় তাকেও পাগল বলা যায়। (মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ, ২০০৪ : ২৪)

নকশা, প্রতীক ও উপস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সুপ্রাচীন নন্দনশিল্পের আধুনিক পরিভাষা বলা যায় বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইনকে। এই পরিভাষার আওতাভুক্ত হয়েছে টেলিভিশন থেকে পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদি ও যাবতীয় প্রকাশনা, বিলবোর্ড, নিওন সাইন, সাইনবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন প্রভৃতি শিল্পমাধ্যম। ছাপা-পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কারণে পোশাকশিল্প থেকে এ শিল্পমাধ্যমটির নিত্য ব্যবহারের পণ্য প্রচার ও প্রসারে বেশ ভূমিকা রয়েছে। যার ফলে গ্রাফিক ডিজাইন পরিচিতি লাভ করে বাণিজ্যিক শিল্পকলা (Commercial Art) নামে। তবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাহায্য সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তথ্য-নির্দেশনা, প্রচার, প্রকাশনা প্রভৃতি কাজে গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহারও ব্যাপক। বর্তমান সময়ে গ্রাফিক ডিজাইনকে বলা হয় Visual Communication বা দৃষ্টিনির্ভর ভাষায় যোগাযোগ সৃষ্টির নন্দনশিল্প। 'গ্রাফিক' কথাটি ড্রইংয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য, পরিচয়, বার্তা, নির্দেশনা বা আইডিয়া গ্রাহকের কাছে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য একটি দৃষ্টিনির্ভর ভাষা। এক্ষেত্রে প্রধান দুটি উপাদান হলো টাইপোগ্রাফি ও ইমেজ। মানুষের সেই তথ্যবহুল ইমেজ থেকে আনন্দবোধ

ও আনন্দ প্রকাশের প্রেরণা হতে নকশার জন্ম। শিল্পের অনাদরে মানসিক উন্নতির অধোগতি হয়। কেবল খেয়ে আর পরেই মানুষ বাঁচতে পারে না, আনন্দই মানুষের প্রাণ, জাতির প্রাণ। মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ বলেছেন যে, "কেউ যদি মনে করে আমাদের দেশে শিল্পসৃষ্টির কোনো মূল্য নেই, কেবল চালের কল ও কটন মিল প্রতিষ্ঠা করলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে, তাহলে তার মতো ভ্রান্তিতে আর কেউ নেই। যে জাতির প্রাণ বুকের কাছে ধুকধুক করে, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করাকেও দৃষ্টিশক্তির অপচয় মনে করে তাহলে আজকের এই স্বাধীন দেশে বেঁচে থাকাটাও অর্থহীন হয়ে পড়ত" (মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ, ২০০৪ : ৪৩৮)।

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের আপাদমস্তক বলয়ের মাঝে বিজ্ঞাপন এবং বিপণন গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছে। গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রয়োজন অনুযায়ী নানান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পী যে আনন্দজাত মনোজগৎ থেকে যতটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন সেটা সহজলভ্য হলেও তা সবার ঘরে ঘরে সৌন্দর্য পাওয়ার জন্যই এবং এ কাজ চালানো কিংবা নানান পণ্যে প্রয়োগ করা তা পণ্যের সৌন্দর্যের জন্যই কারিগরের এক ধরনের কারুশিল্প। এখানেই সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রয়োজনের যোগ আর শিল্পের সাথে পণ্যের মিল। মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ বলেছেন,

> পরম্পরা পুনরুদ্ধারে গ্রাফিক ডিজাইন আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে একথা এদেশের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার আর প্রয়োজন নাই। প্রথমে দেখবো যে, কেন গ্রাফিক ডিজাইন বা নকশা প্রয়োজন। কারণ উত্তরে বলা যায় শিক্ষায় যেমন মানুষের চিত্তের প্রসার হয়, মানসিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, হিতাহিত জ্ঞানবোধ জাগ্রত হয় ও উপার্জন করার এবং অন্য উপায়ে সংসার যাত্রায় নির্বাহ করার দক্ষতা বাড়ে। মোটামুটি এই কয়টি কারণেই আমাদের শিক্ষা প্রয়োজন। তেমনিভাবে একজন ক্রেতা যখন দেখে তার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে দোকানে যায় তখন যদি সে দেখে সৌন্দর্য অলংকৃত কিছু পণ্য তাহলেও তার চিত্ত প্রসার হয়ে ওঠে আনন্দে। শিল্প সৃষ্টির সাহায্যেই শিল্প-শিক্ষা অগ্রসর হয়।(মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ, ২০০৪ : ৪২৪)

আধুনিক যুগের গ্রাফিক ডিজাইন প্রচার মাধ্যমে অবাধ প্রতিযোগিতার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তার মধ্যেই উদ্ভব ঘটেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার দর্শন। সেদিনকার বুর্জোয়া এবং আজকের

প্রচারের সংস্থাগুলো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার অনেকটা স্বাধীনতার স্লোগানের মতো। শুরু থেকেই বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর মূলমন্ত্র ছিল পণ্যের আত্মপ্রতিষ্ঠারই বীজমন্ত্র। প্রচার যখন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার কথা তখন পণ্য উৎপাদিত সংস্থাগুলো গ্রাফিক ডিজাইনের দ্বারস্থ হতে লাগল। তখন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হতে থাকে। প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তার সুদূরপ্রসারী সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন হলো আধুনিককালের প্রধান প্রচার মাধ্যম। যার মধ্যে পণ্যের বিজ্ঞাপন একটি নতুন মাধ্যম। 'প্রচারেই প্রসার' এই কথাটি বাণিজ্যিক জগতে বহুল প্রচারিত। পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্যের উৎপাদন, প্রতিষ্ঠান পরিচিতি, উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণ আর বিপণনের ক্ষেত্রে পণ্যের সারিতে নিজের দেশের পণ্যকে মনোলোভা, হৃদয়গ্রাহী, আর ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে পণ্যের গুণাগুণ প্রচার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বিপণন দক্ষতা বিচারের যে মানদণ্ড বা নির্ণায়ক খুঁজে পাই তা কোন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর বিপণন দক্ষতা মূল্যায়ন নয় বরঞ্চ সামাজিক দৃষ্টিতে দক্ষতা মূল্যায়ন (আবদুল্লাহ ১৯৭৬ : ১৭৬)।

গত পঞ্চাশ বছরে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সে যুগে সংবাদপত্র শুধু সংবাদ সরবরাহ ও মতামতের প্রকাশ মাধ্যম ছিল। কিন্তু আজকাল এটি সংবাদ পরিবেশন ও মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছাড়া পণ্য বিজ্ঞাপন ও আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমেও পরিণত হয়েছে। পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এখানে তার সাথে বেড়ে চলেছে পণ্য উৎপাদন। এখন সারা বিশ্বে পত্রপত্রিকার সংখ্যা অনেক। বেতার থেকে আজ অবধি চলছে সেই পুরোনো প্রচার। যা ১৯২০ সালের পূর্বে সম্ভব হয়নি যতটা আজকাল প্রচার মাধ্যমটি গ্রাফিক ডিজাইনের ফলে উন্নত হয়েছে। আধুনিককালে এসব উন্নতি সাধিত হয়েছে। তার মাঝে আজকের দিনে 'ফেসবুক' সেখানেও হাজার হাজার পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার হচ্ছে। টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোর উন্নতি হয়েছে একমাত্র গ্রাফিক ডিজাইনের ফলে। তার চেয়ে বরং প্রচার মাধ্যমে যে জিনিসটি আগে প্রয়োজন সেটি হলো উপস্থাপন আর সে কাজটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে বর্তমানের গ্রাফিক ডিজাইন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রাফিক ডিজাইন পণ্যের প্রচারই শুধু করে না তা মানুষকে পণ্য ব্যবহারের রুচি তৈরি করতেও সাহায্য করে। আমাদের দেশে আগে সবচেয়ে বেশি প্রচারণা হতো রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে। গ্রাফিক ডিজাইনের প্রচার ও প্রসার দেখে মনে হয় অন্য মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে প্রচার করা সম্ভব নয়। পণ্যের প্রচার এবং

গণসংযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে সমাজে তাতে গ্রাফিক ডিজাইনের প্রভাব অপরিসীম। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রচারের ক্ষেত্রে লেগে আছে গ্রাফিক ডিজাইনের অস্তিত্ব। গোটা মানব সমাজের প্রগতির পক্ষে গ্রাফিক ডিজাইন পণ্যের প্রচার মাধ্যমকে সাহায্য করে আসছে। ক্ষতিকর নানা প্রচারের সমাধান করে, সমাধানের পথ বের করেছে এই প্রচার মাধ্যমটি। গ্রাফিক ডিজাইন মাধ্যমটি প্রচার মাধ্যমের সাথে জড়িত সব মাধ্যমকে নিত্য-নতুন পরিকল্পনা দিয়ে আসছে। আমরা যদি দেখি সাম্প্রতিককালে কতিপয় সামাজিক প্রচার মাধ্যম তাহলে দেখতে পাব এই মাধ্যমটি সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম। কীভাবে প্রচার মাধ্যম বৃহত্তর জনসাধারণের মতামতকে প্রভাবিত করে বিশেষভাবে উৎসাহী করে তুলছে এই গ্রাফিক ডিজাইন মাধ্যমটি তা সত্যিই এক তাক লাগানো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাফিক ডিজাইন যেহেতু প্রচার মাধ্যমসমূহের মাঝে একটি তবু সেটা পণ্য প্রচার এবং জনসাধারণের ওপর এটি এক ধরনের গবেষণার প্রয়াস পেয়েছে। গ্রাফিক ডিজাইনে প্রধানত যে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো তথ্য, পরিচয়, বার্তা, নির্দেশনা ও আইডিয়া উপস্থাপনের জন্য শিল্পকর্ম (Artwork) তৈরি। এগুলো হলো–

১. ইনস্টিটিউশন : রাষ্ট্র, সংস্থা, বাহিনী, ফাউন্ডেশন, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, ব্যক্তি।
২. প্রকাশনা/প্রোডাক্ট : টাইপসেট, বই, পত্রিকা, পোস্টার, টি-শার্ট, প্যাকেজিং।
৩. সার্ভিস : শিক্ষা, উন্নয়ন, পর্যটন, হোটেল, চিকিৎসা, টেলিফোন, সেন্টার।
৪. ইভেন্ট : উৎসব, প্রদর্শনী, বার্ষিকী, সম্মেলন, অভিযান, সভা, কর্মশালা, আয়োজন।

বিজ্ঞাপন যেমন মানুষের কাছে একটি বার্তা তেমনি সেটি এক ধরনের সুন্দরের উপস্থাপন। সেখানে যোগ হয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি-নির্ভর গ্রাফিক ডিজাইন। বাণিজ্যের কৌশলগত ও সুনিপুণ উপস্থাপনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইন ব্যবহৃত হয় পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে। যেন পণ্যকে টিকিয়ে রাখার শৈল্পিক এক ভিন্ন পদ্ধতি। পণ্য বিজ্ঞাপনে গ্রাফিক ডিজাইন ও উন্নয়ন ভাবনার নতুন নতুন অগ্রগতিকে তুলে ধরেছে বর্তমান সময়ের গ্রাফিক ডিজাইন। এছাড়াও–

- সকল পণ্যকে শৈল্পিক প্রচারণার মাধ্যমে বৈচিত্র্যকরণ ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা
- সকল পণ্যের ভোক্তা নিশ্চিতকরণ।
- গ্রাফিক ডিজাইনের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও পণ্য উপস্থাপনে বর্তমান মানদণ্ড নির্ধারণ।

- পণ্যের মান নির্ণয়ে অতীত ও বর্তমান পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ।
- পণ্য প্রচারে সম্ভাবনা ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরিতে গ্রাফিক ডিজাইন কতটুকু সার্থক হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে তারই একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। ক্রমোন্নতি গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যারের নান্দনিক ব্যবহার এবং পণ্য প্রচারের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে পণ্যের সচেতনতা ও সম্ভাবনা।

শুধু মুখের কথায় বর্তমানে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব না, উৎপাদিত পণ্যের প্রচার হলো প্রতিযোগিতার বাজারে ভালো পণ্যটিকে সুন্দর এবং সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপন করা। গ্রাফিক ডিজাইন হলো বর্তমান বিজ্ঞাপন জগতের বাস্তবতা। এক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনারদের সফলতা, তাদের উপস্থাপন, পণ্য প্রচারে তাদের অবদান খুবই জরুরি। কোনো একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচার ও প্রসার ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। ক্রেতার সন্তুষ্টি থেকে শুরু করে বাজার প্রভৃতি বিষয় যথাযথ গ্রাফিক ডিজাইনের ওপর নির্ভরশীল। উত্তম ডিজাইন আর উত্তম পণ্য বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে পণ্যের ডিজাইন ক্রেতাদের নানাভাবে আকর্ষণ করে। একজন ডিজাইনারের উৎপাদিত পণ্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সুন্দর ডিজাইনের সাথে পণ্যের কার্যকারিতার সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের লোগো ডিজাইনের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, এগুলো প্রথম দর্শনেই দর্শক দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। কারণ এসব লোগো ডিজাইনের পেছনে গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। যা একজন ডিজাইনার পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে সুপরিকল্পিত কৌশল, ডিজাইনের নীতি, ব্র্যান্ডসহ উৎপাদিত সকল পণ্যেকে জনপ্রিয় করার মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন–জনপ্রিয় কুরিয়ার সার্ভিস FedEx-এর লোগোতে একটা লুকায়িত তীর চিহ্ন আছে যা এই কোম্পানির দ্রুত ডেলিভারির বিষয়টি নিশ্চিত করে। অর্থাৎ কোনো একটি লোগো ডিজাইনের জন্য নেয়া পূর্বপরিকল্পনা সেই লোগোর মাধ্যমে কোম্পানিকে জনপ্রিয় করতে পারে, তেমনি সাধারণ কোনো ভুল ঠিক বিপরীত কিছু করার সম্ভাবনা রাখে। ডিজাইনের পাশাপাশি লোগোর কালার, টাইপফেস, ইমেজ, সিম্বল প্রভৃতি বিষয় সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে। তাই একজন দক্ষ ডিজাইনারের বেশ কিছু বিষয় মেনে চলা খুবই জরুরি। যেমন : ক্রেতা ও ডিজাইনারের ভেতর ভালো যোগাযোগ ও আলোচনার ব্যাপারটি অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার রূপ নেয়। গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ হলো ক্রেতার মনমতো করে ডিজাইন

করে দেওয়া। এতে যদি ডিজাইনার ব্যর্থ হয় তবে পণ্যের মান যতই ভালো হোক না কেন ক্রেতার তা পছন্দ হবে না। তাই প্রত্যেক ডিজাইনার কে ক্রেতার মানসিক অবস্থাটি বুঝবার মতো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেজন্য আলোচনা করে, শর্ট নোটস ও ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে। Mreuvav চিন্তা না করা, ডিজাইনের ভেতর সবসময় আলাদা সৃজনশীলতা থাকতে হবে। সেটা ক্যাপশন বা ডিজাইনেও হতে পারে। গ্রাফিক ডিজাইন পুরোটাই একটি সৃজনশীল জায়গা, সেভাবেই বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হবে। তাই বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজনে ডিজাইনারের উচিত গতানুগতিক ডিজাইন না করে আগে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখে নেয়া। বাজারে সর্বপ্রথম যখন পণ্য ছাড়া হয় তখন থেকে এর প্রচার শুরু হয়। তারপর পণ্যের গুণমানের প্রশ্ন আসে। তাই উৎপাদকের উচিত গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে কিংবা কোনো ভালো বিজ্ঞাপনী সংস্থার মাধ্যমে তার নতুন পণ্যটির প্রচার এবং মার্কেটিং কৌশল অবলম্বনে প্রচার কার্য পরিচালনা করা।

> যে সব কৌশল অবলম্বন করে পণ্যের প্রচার করা যায় তার মধ্যে রয়েছে– পণ্যের গুণমান উন্নয়ন, নতুন নতুন মডেল সংযোজন, নতুন বাজারে অংশগ্রহণ, নিত্য নতুন পণ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান, পণ্য প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের প্রকৃতি ও মাধ্যমে নতুনত্ব আনয়ন, মূল্য সংবেদনশীল ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেমন–ব্র্যান্ড হতে পারে। ব্র্যান্ড হলো প্রতীক, চিহ্ন বা ডিজাইন। যেখানে গ্রাফিক ডিজাইনের ভূমিকা অনেক ব্র্যান্ডকে পরিচিত হতে সাহায্য করে। ব্র্যান্ডের সুবিধা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন–ব্র্যান্ড দ্বারা পণ্যকে আলাদা করা, মান ও পণ্যের দামে নিশ্চিত থাকা, বাজার রক্ষা করা, ব্যাবসায়িক ও আইনগত সংরক্ষণ, পণ্য সরবরাহ, লিগ্যাল প্রোটেকশন, ভাবমূর্তি সৃষ্টি, মধ্যস্থকারবারীদের উৎসাহ প্রদান প্রভৃতিসহ নানা সুবিধা পাওয়া যায় পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে। (মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ, ২০০৪ : ১১৭)

যে পণ্যের আগে কোথাও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এই প্রথমবারের মতো প্রস্তুত হয়েছে এমন পণ্যকে আমরা নতুন পণ্য বলতে পারি। আবার বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যদি পণ্যের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলেও উৎপাদিত পণ্যকে নতুন পণ্য হিসেবে ধরা যায়। কোনো কোম্পানি যদি পণ্য প্রস্তুত করে তাও কোম্পানির কাছে নতুন পণ্য। একটি নতুন পণ্য বাজারে আসার পর এর প্রচারণা ছাড়া তার উন্নয়নে অনেক কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ নতুন পণ্যটি সবার কাছে অপরিচিত থাকে। কেননা নতুন পণ্যটি ভোক্তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মেটাতে পারবে কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ থাকে। পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন পণ্যের ব্যর্থতার হার অনেকটা বিজ্ঞাপন সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশে প্রায় সকল পণ্যের প্রচার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই উপস্থাপন করে প্রচার করা হয়। অপর একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্যাকেটকৃত ভোগ্যপণ্যের ব্যর্থতার হার ৮০%। নতুন পণ্যের বিফলতার হার ৯৫%-এর চেয়েও বেশি। (Deloitte, 1998 : 318)। প্রচার হলো মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা অভিনব উপায়মাত্র। মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে মানুষের চিন্তা ও মনকে প্রভাবিত করা যায়। এছাড়া ছবি ও গানের মাধ্যমে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে প্রচারণা করা সম্ভব। (Propaganda) সাধারণত কোনো অসমর্থিত সিদ্ধান্ত কিংবা এমন কোনো প্রস্তাবের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলা একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিমাত্র। অর্থাৎ সমাজে যা সর্বজনগ্রাহ্য তার জন্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে। স্যামুয়েল কোনিগ তাঁর *সমাজ বিজ্ঞান* গ্রন্থে বলেন,

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'Propaganda' শব্দটির মন্দ দিকটির কথাই বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকানরা প্রচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠান এবং জার্মানরা একে প্রচার দপ্তর (Ministry of Propaganda) বলে অভিহিত করেছে। আমেরিকানরা 'Propaganda' কথার পরিবর্তে জনসংযোগ কথাটি ব্যবহার করার পদ্ধতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। প্রচার একটি বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রচার ব্যবস্থাকে একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। (স্যামুয়েল, ২০০২ : ১২১)

গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যবহার

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, গ্রাফিক ডিজাইন ব্যবহার হয় শুধু প্রিন্টিং টেকনোলজিতে। এটা সত্যি যে, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের অগ্রসরমান দেশগুলোতে গ্রাফিক ডিজাইন ব্যবহার বিগত সালের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। সেক্ষেত্রে প্রিন্টিং সংক্রান্ত বিষয় কিংবা খুব বেশি হলে কোনো স্থিরচিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে গ্রাফিক ডিজাইন ব্যবহার করা হয়। প্রকাশের সৃজনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রাফিক ডিজাইনের চর্চা ভিন্ন আঙ্গিকে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান। মূলত গ্রাফিক ডিজাইন দৃষ্টিনির্ভর ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার যেভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করছে, অডিও ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বর্তমান গ্রাফিক ডিজাইনের নান্দনিকতা এক উল্লেখযোগ্য সহায়ক।

নিম্নে কয়েকটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংযোজন করা হলো :

চিত্র : ১

চিত্র : ২

চিত্র : ৩

এই বিজ্ঞাপন (চিত্র : ১, ২, ৩) চিত্রের ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনে কার্যকর ও নান্দনিক মাধ্যমটিই হলো গ্রাফিক ডিজাইন। বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি পরিবর্তনে ছোঁয়া লেগেছে প্রায় সব জায়গায় বিশেষ করে বিভিন্ন চ্যানেলে। গ্রাফিক ডিজাইন বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশনের উপস্থাপকের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও মিডিয়ার বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে (মুভি ক্লিপ) হিসেবে ব্যবহৃত হয় গ্রাফিক ডিজাইন। এমনকি সিনেমার স্পেশাল ইফেক্টের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে চলমান বা স্থির ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরিতে গ্রাফিক ডিজাইনের কোনো বিকল্প নেই। আমরা যে খবরের পেছনে সুন্দর সুন্দর এনিমেশনগুলো দেখি তা গ্রাফিক ডিজাইনের কল্যাণে। টেলিভিশনের যেকোনো অনুষ্ঠানের সেট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড। সকল পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন নান্দনিক কৌশল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের পর হতে শুরু করে উক্ত পণ্য বিলীন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচার কিংবা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন রয়েছে। পণ্য প্রচারের জন্য ফটোগ্রাফির মান উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞাপন আর প্রচার কাজের ক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ওপর পণ্যের বিজ্ঞাপনগুলো বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিগত ৫০ বছর ধরে পণ্য প্রচারে প্রযুক্তি-নির্ভর গ্রাফিক ডিজাইন বেশ উন্নতি সাধন করে আসছে। সংযোজিত পত্রিকা বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে সহজে অনুমেয় হবে (চিত্র : ৪)।

নেতৃত্বের সংকট

নির্বিঘ্ন হবে তো ঈদযাত্রা

অনিশ্চয়তা নিরীক্ষা আপত্তি বাজেটের দ্বিগুণেরও বেশি

EXIM

এবার LUX কিনে

জিতে নিতে পারেন সুরভিত

সোনার লকেট!

চিত্র : ৪

যেখানে নব্বই দশকে শুরু হয়েছে এই পরিবর্তন। নব্বই দশকে মুদ্রণ শিল্পের পাশাপাশি অফসেট, ফটো লিথোগ্রাফি পদ্ধতির হাত ধরেই আজকের প্রচারমুখী গ্রাফিক ডিজাইন। গ্রাফিক ডিজাইন মানুষকে মুক্তির মালা পরিয়েছে। এসব কিছু শুরু হয়েছে গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যার আবিষ্কারের পর। বাংলাদেশে পণ্যের প্রচার গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে শুরু হলেও এর কালপর্ব ধরা হয় ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল। পণ্য প্রচারে এই কালপর্বের ক্রমোন্নতি আজও চলছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০-পণ্য প্রচারকে রঙিন করে উপস্থাপন করে গ্রাফিক ডিজাইন। অতি অল্প সময়ে একটি পণ্যকে প্রচার করতে গ্রাফিক ডিজাইনের অবদান অপরিসীম। প্রথমে ডিজাইনের ধারণাটি মাথায় রেখে আর্টিস্ট গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন ইফেক্ট ব্যবহার করে ডিজাইনের মান বৃদ্ধি করে পণ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বাজারজাতকরণের গুরুত্ব ব্যাপক। তারপর মানুষের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা বিধান, সুষ্ঠু বন্টন, উপযোগ সৃষ্টি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক বাণিজ্যের আনয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, ব্যবসায়ের অস্তিত্ব রক্ষা, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রভৃতি রক্ষা করে মানুষকে সচেতন করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা দেশে ও বিদেশে প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ক্রেতাদের নতুন প্রয়োজন ও অভাবকে সৃষ্টি করে বিজ্ঞাপন পণ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা হলে ভোক্তা এবং উৎপাদনকারীর দূরত্ব কমে যাবে। এক্ষেত্রে গ্রাফিক ডিজাইনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে বিক্রেতার নিকট হতে পণ্য, সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দিয়ে স্থানগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

গ্রাফিক ডিজাইন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন তৈরির সফলতা বাজারজাতকরণ বা মার্কেটিং শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করে। ফলে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাতকরণের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর প্রচারণায়। ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রচার বাজারজাতকরণকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে ভোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে। সময়ের চাকার পিঠে আবর্তিত সমাজ সভ্যতার বিকাশ, সাথে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা প্রতিনিয়ত মানুষকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন করতে হবে সময়োপযোগী পণ্য।

তথ্যপঞ্জি

আবদুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশ পণ্য বিপণন ব্যবস্থা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬

মোজাহারুল হক, ১৯৮৪। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্প ও তার তাৎপর্য (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ)। গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (২০০৪)। বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

স্যািমুয়েল কোনিগ (২০০২)। সমাজ বিজ্ঞান, রংগলাল সেন–অনূদিত, জে. কে প্রেস এণ্ড পাবলিকে-শন্স, ঢাকা।

Deloitte Touche (1998) | *Vision in Management Study,* Deloitte and Consulting and Keanan.

Philip Kotler & G. A (1998) | *Principles of Marketing.* Prentice Hall.

সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রা : নকশা পর্যালোচনা

ড. ফারজানা আহমেদ*

সারসংক্ষেপ : ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই একই বছরে বাংলাদেশে প্রথম কোষাগার নোট চালু করে। সেই থেকেই এদেশে যাত্রা শুরু হলো নিজস্ব কাগুজে মুদ্রা, যা টাকা নামে পরিচিত। এই কাগুজে মুদ্রার সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান অব্দি নানা রকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নকশার বৈচিত্র্যতায় তা কেমন ছিল, কী কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব অন্বেষণ এই প্রবন্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সত্তর দশকে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রার নকশা বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা আলোকপাত করার ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধটি ভূমিকা রাখবে।

ভূমিকা

কবে থেকে এবং কখন কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয় তার সুনির্দিষ্ট ইতিহাস নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। পেশাভিত্তিক সমাজে মানব সভ্যতার ইতিহাসের উষালগ্নে ছিল বিনিময় প্রথা। যা ছিল লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। ধারণা করা হয়, অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশরা কাগজের মুদ্রা ব্যবহার শুরু করে। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্যাংক অব বেঙ্গল ভারতবর্ষে প্রথম দুইশত পঞ্চাশ সিক্কা রুপি নোট প্রকাশ করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং পাকিস্তানের একটি

---

* সহকারী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অংশ হিসেবে গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত লাখো বাঙালি মুক্তিযোদ্ধার জীবন বিসর্জন ও নয় মাসের রক্তপাতের পরে হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ের সরকার পাকিস্তানের রাজ্য ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের কার্যালয়ের সম্পদ ও দায় স্বীকার করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করে। স্থায়ী কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন আ ন ম হামিদউল্লাহ্। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের মুদ্রার নামকরণ গৃহীত হয় 'টাকা' এবং মুদ্রার প্রতীক হয় '৳'। ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ সরকারি মুদ্রা হিসেবে 'টাকা'কে ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে প্রথম কোষাগার নোট চালু করে যার মূল্যমান ছিল ১ টাকা। সেই থেকে কাগুজে নোট হলো টাকা। কাগুজে মুদ্রা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কর্তৃক প্রবর্তিত। ব্যতিক্রম ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট অর্থ সচিবের স্বাক্ষরে অবমুক্ত করা হয়। বাকি সব নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। বর্তমানে ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের কাগুজে মুদ্রা প্রচলিত আছে। ২০০৮ সালে প্রথম বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মূল্যমানের ১০০০ টাকার নোটের প্রচলন হয় (মোহাম্মদ, ২০২০ : ৭৪)।

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস NASIK থেকে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে জরুরিভিত্তিতে ১ টাকা ও ১০০ টাকার কাগুজে নোট মুদ্রণ করে বাংলাদেশের নিজস্ব কারেন্সি অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু ভারতের নোটে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের ঘাটতি ছিল। তাই পরবর্তী সময়ে ভারতে মুদ্রিত নোটসমূহ অচল ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক নিজস্ব কারেন্সি ও ব্যাংক নোট নিজ দেশেই মুদ্রণের লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়সহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস বিষয়ে সুইজারল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডি-লা-রু-জিউরির কারিগরি সহায়তায় এবং ECNEC-এর অনুমোদনক্রমে 'সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস প্রকল্প'টি রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী

জেলা গাজিপুর সদরের একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ স্থান শিমুলতলীতে স্থাপনার কাজ শুরু হয়।

১৯৮৮ সালে ১ টাকা মূল্যমানের কারেন্সি নোট ও ১০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগুজে মুদ্রা উৎপাদন এবং ১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর কালক্রমে অন্যান্য মেশিনপত্র স্থাপন এবং সফলভাবে অন্যান্য মূল্যমানের নোটও মুদ্রণ শুরু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল কাগুজে নোটসহ ডাক বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, শিক্ষাবোর্ড, বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুযায়ী বিবিধ নিরাপত্তা সামগ্রী মুদ্রণ কাজ এ প্রতিষ্ঠানে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং প্রেরণায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংবলিত নতুন ডিজাইনের সবগুলো ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে (তথ্যসূত্র : কালের সাক্ষী)।

চিত্র ১ : বঙ্গবন্ধুর কাছে নতুন নোট হস্তান্তর, ১৯৭২ সাল

জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে, নোট ছাপানোর জন্য, মাত্র কয়েকটি দেশের নিজস্ব সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নিজস্ব সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থেই গৌরব ও অহংকার (মোহাম্মদ, ২০২০ : ৭৪)। ১৯৭২ সালে (চিত্র-১) স্বাধীন রাষ্ট্রের জনক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট বাংলাদেশের প্রথম কারেন্সি নোট ও মুদ্রা হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর আ ন ম হামিদউল্লাহ্। পাশে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সংখ্যামানের কাগুজে মুদ্রার নকশা

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন হতেই যখন মুদ্রার প্রচলন, ঠিক তখন থেকেই মুদ্রার মুখ্যপিঠে রাজা বা সম্রাটের প্রতিকৃতি শোভা পেত। সেই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশের কাগুজে মুদ্রায় ও ধাতব মুদ্রায় রাষ্ট্রনায়কের প্রতিকৃতি যথাযথ মর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

১৯৭২ সাল

১ টাকার কাগুজে মুদ্রা
১৯৭২ সালের ৪ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে অবস্থিত আউট লাইন বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে Guilloche pattern এবং সংখ্যামান ১ বাংলায় মাঝ বরাবর লেখা রয়েছে।

নকশা (Design) : দ ুপার্শ্বের বর্ডারেই ইসলামিক মোটিফের আদলের সমন্বয়ে নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : এ মুদ্রার নকশাটি সচিত্রকরণধর্মী নয়।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ এবং বিপরীত দিকে Guilloche pattern-এর ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। ইংরেজি সংখ্যাতে '1' লেখাটি আপ করা হয়েছে এবং বাকি বাংলায় কথায় লেখা সংখ্যাটি ডাউন করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, ম্যাপের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলা এবং ইংরেজিতে সুপরিকল্পিতভাবে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুই পাশে দুটো ফুলের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে এঙ্গেল করা

চতুর্ভুজের মাঝে বাম পাশে বাংলায় ১ ও ডান পাশে ইংরেজিতে 1 লেখা রয়েছে। বাংলা ভাষার আধিক্য এখানে লক্ষণীয়।

জলছাপ (Watermark) : নেই।

রঙ (Colour) : বেগুনি, কমলা ও সবুজ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ৯৮ x ৬৩ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নেই।

শিল্পীর নাম (Artist’s Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (NASIK) থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের এক টাকা মূল্যমানের ব্যাংকনোট অবমুক্ত করা হয়।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব কে. এ. জামান (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। জাল হবার কারণে নোটটি ৩০শে মার্চ ১৯৭৪ সালে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

চিত্র ২ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

সম্মুখভাগ (Obverse) : নোটের সম্মুখ দিকে ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

বিপরীত দিক (Reverse) : পেছনের দিকে ছিল জ্যামিতিক নকশা।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের নকশায় Guilloche pattern ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পাশে বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি বাস্তবধর্মী সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগ ও বিপরীতভাগে ফুল ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে ওপরে বাংলায় ৫ এবং ইংরেজি সংখ্যাতে '৫' লেখা। তার নিচে কথায় দুইপাশে পাঁচ টাকা ও FIVE TAKA ক্যালিগ্রাফিতে লেখা রয়েছে। বিপরীত দিকে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 লেখা। নিচে কথায় দুইপাশে পাঁচ টাকা ও FIVE TAKA ক্যালিগ্রাফিতে লেখা রয়েছে, যা খুবই দৃষ্টিনন্দিত।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটি অলংকরণধর্মী। মুদ্রাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুইপাশের বাংলা ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লেখা তার নিচে ফ্লোরাল স্পাইরাল নকশাটি দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে মাঝখানে বাংলা ও ইংরেজিতে পাঁচ সংখ্যামান লিখে পেছনে ফুলের অলংকরণ করা হয়েছে। এ নোটটির কম্পোজিশনে নান্দনিকতা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপ দেখা যায় না।

রং (Colour) : বেগুনি, সবুজ ও কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১১৭ x ৬৩ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য, নোটের ডানদিকে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : নেই

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের মহারাষ্ট্রের NASIK-সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে এ নোট।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল নোটটি জাল হবার কারণে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

চিত্র ৩ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ভারত থেকে মুদ্রিত নোটের সম্মুখ দিকে রয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে জ্যামিতিক নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। মুদ্রার সজ্জায় Guilloche pattern এ অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের ম্যাপ রয়েছে। বিপরীত পৃষ্ঠে কিছু ফ্লোরাল সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের যা Guilloche pattern নামে পরিচিত তার সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। বাংলায় কথায় 'দশ টাকা' এবং ইংরেজিতে 'Ten Taka' লেখা সংবলিত নোটটিতে রয়েছে নান্দনিকতা। কারণ, ডিজাইনিকরূপে যথার্থ।

অলংকরণ (Ornamentation) : বেশি অলংকরণধর্মী। এ মুদ্রাটিতে স্পাইরাল ফর্মের প্যাটার্ন দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার বিপরীতভাগের মধ্যভাগে বাংলায় ১০ ও ইংরেজিতে ১০ লেখাটি রয়েছে যার নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপ নেই।

রং (Colour) : বেগুনি, সবুজ ও কমলা রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৩৭ x ৬৩ মিঃমিঃ

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ভারতের সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (NASIK) থেকে ছাপা হয়।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। কাগজের মান খুব ভালো ছিল না। ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল এই নোটকে অচল ঘোষণা করা হয়।

চিত্র ৪ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা মার্চ ১৯৭২ সাল

১৯৭২ সালের ২রা জুন বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : সামনের দিকে শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি (মুখ বাম দিকে ফেরানো)।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ দৃশ্য-নদী, নৌকা, ধানখেত, পাটখেত।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বিপরীত পৃষ্ঠে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবি বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, লতাপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে তিনদিকে বাংলা ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লেখা। নিচে বোল্ড ফন্টে বাংলা ১০ সংখ্যামানের পাশে টাকার সিম্বলটি উপস্থাপিত হয়েছে। বিপরীত পাশে আড়াআড়িভাবে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত তবে নিচে ইংরেজি বোল্ড সংখ্যাতে ১০ লেখা। কখনো কখনো স্ট্রোক আবার কখনো কখনো ফিল কালারে তা অলংকৃত করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে সচরাচর পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে সাদা বৃত্ত অথবা চতুর্ভূজ ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়। কিন্তু এ মুদ্রাটিতে স্পাইরাল ফর্মের সাদা প্যাটার্ন দেখা যায়। যা নতুনত্ব এনেছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরে মধ্যভাগে বাংলায় কথায় বাংলাদেশ ব্যাংক লেখাটির নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা এবং বামপাশের উল্লম্বভাবে বর্ডারের সাথে ইংরেজিতে Bangladesh Bank লেখাটি একটি নতুন রূপ প্রদান করেছে। অপরদিকে চারপাশে বর্ডার দেখা যায় তাতে বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা এবং TEN TAKA লেখাটি সাদা রঙে যা উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের মাথা দেখা যায়।

রং (Colour) : নোটের রং সামনে নীল, সবুজ ও খয়েরি এবং পিছনে সবুজ রংয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মিঃমিঃ

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মাঝখানে নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : শিল্পী কে. জি. মুস্তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : টমাস ডি লা লু **(Thomas De La Rue) (TDLR)**, ইংল্যান্ড।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব এ. এন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ৫ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২ জুন ১৯৭২ সাল

১৯৭৩ সাল

১৯৭৩ সালের ২ মার্চ বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তিত নকশা প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে রয়েছে একগুচ্ছ ধানের শিষ।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে নকশাকৃত বৃত্তের মাঝে আমাদের জাতীয় প্রতীক শাপলা রয়েছে।

নকশা (Design) : দুপার্শ্বের বর্ডারেই সূক্ষ ত্রিভূজ আকৃতির মোটিফের নকশা দেখা যায়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : একগুচ্ছ ধানের শিষ হাতে সচিত্রকরণ লক্ষ্য করা যায়।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ এবং বিপরীত দিকে কলকা এবং ফ্লোরাল মোটিফের সমন্বয়ে কম্পোজিশন করা হয়েছে।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, অলংকৃত মোটিফের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলায় স্ট্রিপের মাঝে অলংকরণ করা হয়েছে। পুরো মুদ্রাটি জুড়ে হালকা রঙের ফ্লোরাল নকশা রিভার্সে অলংকৃত।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুই পাশে দুটো পানপাতার ন্যায় বৃত্তের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে ও নিচেও দুটি নকশি পিঠার আদলের বৃত্তের মাঝে বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরভাগে চারপাশে ৪টি চতুর্ভুজের মাঝে ক্রস করে বাংলায় ১ ও ইংরেজিতে 1 লেখা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শরীরসহ মাথা মুদ্রার ডানপাশে লক্ষ করা যায়।

রং (Colour) : হালকা বেগুনি ও সোনালি রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য তবে কাগুজে মুদ্রার মাঝখানে তা স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : প্রেসের নামটি পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব মতিউল ইসলাম (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

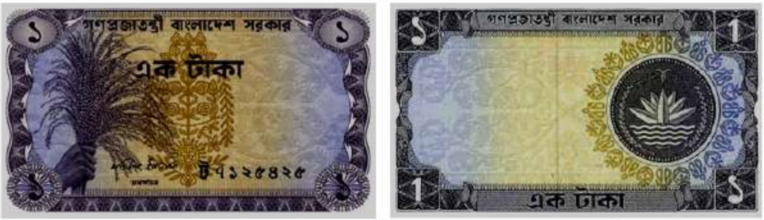

চিত্র ৬ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২রা মার্চ ১৯৭৩ সাল

১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রায় পুনরায় পরিবর্তিত নকশা প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : পরিবর্তিত নকশাটিতে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার সম্মুখভাগের বামপাশে একজন মহিলা ধান মাড়াচ্ছে, নিচে মুরগির ছানা এবং মাঝে লোকজ মোটিফ ।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে ডানপাশে নকশাকৃত বৃত্তের মাঝে আমাদের জাতীয় প্রতীক এবং ধানের শিষ রয়েছে।

নকশা (Design) : দু পার্শ্বের বর্ডারেই খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইনের সমন্বয়ে নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : কাগুজে এ মুদ্রাটির সম্মুখভাগের মহিলাকে স্কেচের সাহায্যে বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মাঝে একটি লোকজ নকশার সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে লোক মোটিফ এবং বিপরীত দিকে ৪টি square pattern-এর ছোটো ছোটো মোটিফ হালকা রঙে ছাপা লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, মাঝখানে অলংকৃত লোকমোটিফের বিন্যাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ লেখাটি বাংলায় স্ট্রিপের মাঝে অলংকরণ করা হয়েছে। পুরো মুদ্রাটির দুপাশ জুড়ে হালকা রঙের লোকজ নকশা রিভার্সে অলংকৃত।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপর ও নিচে লোকজ প্যাটার্নের ওপর বাংলায় সংখ্যামান ১ লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে এঙ্গেল করা বর্ডারের নকশার ওপর বাংলায় ১ ও ইংরেজিতে ১ আড়াআড়িভাবে লেখা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : বাঘের গর্জনের অভিব্যক্তিপূর্ণ জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : বেগুনি, কমলা ও ফিরোজা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য তবে কাগুজে মুদ্রার বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : সুনির্দিষ্টরূপে উল্লেখ নেই।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব মতিউল ইসলাম (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

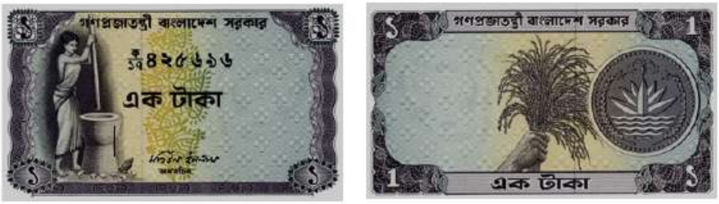

চিত্র ৭ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭৩

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নান্দনিক নোটের সামনের অংশে ছিল লালসহ হালকা নীল, হলুদ ও গোলাপি রঙের ছাপ; বাম দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি, নকশি আলপনা লক্ষণীয়।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে লাল রঙের মাঝে জলাভূমিতে শোভা পাচ্ছে বিকশিত শাপলা ও পাটের শিকা, পুকুর পাড়ে বাঁশঝাড়।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে। বর্ডারের নকশায় লোকজ প্যাটার্ন ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটিতে বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের সমন্বয়ে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে বিভিন্ন নকশা ও লোকমোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বর্ডারে স্পাইরাল প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফিধর্মী লিখনে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ লেখা। ওপরে কথায় মাঝখানে পাঁচ টাকা লেখা

রয়েছে। পেছনের ভাগে দুইপাশে আড়াআড়িভাবে বাংলায় ৫ সংখ্যামান লেখা। ওপরে একপাশে ইংরেজিতে ৫ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত দিকের নিচে মধ্যভাগে বাংলায় কথায় পাঁচ টাকা লেখা তবে ঠিক তার বামপাশেই ইংরেজিতে FIVE TAKA লেখা কিছুটা ছোটো ফন্টে। যা সচরাচর পূর্বের নোট ডিজাইনে দেখা যায়নি।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটি লোকফর্মে অলংকরণ করা হয়েছে। বাস্তবধর্মী অলংকরণের ফলে এ মুদ্রাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা রয়েছে। তবে ওপরের দুটিতে নকশাধর্মী বৃত্তের ৫ লেখা এবং নিচের দুটি আনারস ফলের ফর্মের ওপর ৫ লেখা রয়েছে। বিপরীত দিকে তিনটি নকশাধর্মী চতুর্ভুজের ওপর সংখ্যামান লেখা। বাংলা সংখ্যামানের আধিক্য বেশি দেখা যায়। কম্পোজিশনেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সম্মুখভাগে বর্ডারের প্যাটার্নে বাংলাদেশ ব্যাংক কথাটি বোল্ড ফন্টে লেখা। বিপরীত দিকে ফ্রি স্পেসে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলায় বোল্ড ও ইংরেজিতে তুলনামূলক ছোটো ফন্টে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে ঘোরানো বাঘের মাথা দেখা যায়।

রং (Colour) : লালসহ হালকা নীল, হলুদ ও গোলাপি রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য নিরাপত্তা সুতা নোটের ডানদিকে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : নকশাবিদ ছিলেন শিল্পী কে. জি. মুস্‌তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : টমাস ডি লা লু (Thomas De La Rue) (TDLR), ইংল্যান্ড।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আ. ন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ৮ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৩ সালের ১১ই আগস্ট বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : সামনের দিকে নোটের ডানপাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি (মুখ ডানদিকে ঘোরানো) ও বিভিন্ন নতুন ধরনের নকশা ছিল নোটের চারকোণে দুটি করে পানপাতা।

বিপরীত দিক (Reverse) **:** মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে ধানখেতে কৃষকের ধান কাটার দৃশ্য ও কৃষকের মাথায় পাকা ধান।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকতা থেকে ভিন্নরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। এর জমিনটা ছিল সবুজ যা বাংলাদেশের অন্য কোনো নোটে দেখা যায় না। নোটটি অন্যরকম আকর্ষণীয় ছিল।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ জীবনের ছবি বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে পানপাতা, স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প **(Lettering) :** টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে সচরাচর পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে সাদা বৃত্তের ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরে বাংলায় ১০ সংখ্যামানের নিচে পানপাতা দিয়ে সজ্জিত করায় তা নতুনত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশ

ব্যাংক লেখাটির নিচে ফ্লোরাল প্যাটার্নের নকশা অপরদিকে চারপাশে বর্ডার দেখা যায় তাতে ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশ ব্যাংক রিলিফভাবে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে শরীরসহ বাঘের মাথা বৃত্তের মাঝে দেখা যায়।

রং (Colour) : বিভিন্ন মাত্রার বেগুনি কমলা রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৫৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : অদৃশ্য নিরাপত্তা সুতা, যা নোটের মাঝখানে সম্পৃক্ত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : শিল্পী কে. জি. মুস্তাফা।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : ব্র্যাডবারি উইলকিনসন এন্ড কোম্পানি, ইংল্যান্ড ।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আ. ন. হামিদউল্লাহ্ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত। **১৯৭৪-১৯৭৫** সাল তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন যা ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুতেই প্রভাব পড়ে। স্থবির হয়ে পড়ে সবকিছু। অর্থনৈতিক খাতও এর অন্তর্গত। এই দুই বছর কোনো নতুন নকশার প্রচলন ঘটেনি।

চিত্র ৯ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৩ সাল

১৯৭৬ সাল

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের **১১**ই অক্টোবর বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে পুরান ঢাকার (আরমানিটোলার) ঐতিহাসিক তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের বিপরীত দিকে পাট পাতাসহ কলকারখানার ছবি রয়েছে।

নকশা (Design) : নোটটি তুলনামূলক কম নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় গতানুগতিকতা রয়েছে। বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে। তবে হাফ সার্কেল প্যাটার্ন ব্যবহারে কম্পোজিশনে ভিন্নতা লক্ষণীয়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : সম্মুখভাগে মসজিদের ও বিপরীত দিকে কলকারখানাসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে মাছ, কুলা, ফুলের মোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বিপরীতভাগে নকশি বৃত্ত ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোট ছোট মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ এবং মধ্যভাগে বাংলায় পাঁচ টাকা লেখা। পেছনের ভাগে ডানপাশে বৃত্তের মাঝে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 সংখ্যামানটি লেখা।

অলংকরণ (Ornamentation) : মুদ্রাটি তুলনামূলক অন্যান্য মুদ্রার থেকে কম অলংকরণধর্মী। সম্মুখভাগে সাদা স্পেসের ব্যবহার বেশি তবে বিপরীতভাগে পুরো স্পেস জুড়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ওপরের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে কুলার ফর্মের নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। বিপরীত দিকে ডানপাশে অলংকৃত বৃত্তের উপরে বাংলায় ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। অন্য দুপাশ অর্থাৎ বামপাশে নিচের পাট গাছের ওপর সরাসরি সংখ্যামানগুলো লেখা হয়েছে। যা কম্পোজিশনে ভিন্নতা এনেছে।

জলছাপ (Watermark) : বৃত্তের মাঝে বাঘের মাথাসহ শরীরের জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় পীত খয়েরি রঙের সংমিশ্রণ তবে পাট গাছের পাতাতে সলিড সবুজ রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১০ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১১ই অক্টোবর ১৯৭৬ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১১ই অক্টোবর বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে ঢাকার (আরমানিটোলার) ঐতিহাসিক তারা মসজিদের ছবি রয়েছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে ধানক্ষেতে কর্মরত কৃষকের দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে ডানপাশে মসজিদের ছবি, বামপাশে অর্ধবৃত্ত রঙিন আলপনার ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, জ্যামিতিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে

বাংলায় ১০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে কোনাকুনি বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ১০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের শরীরসহ প্রতিকৃতি দেখা যায়।

রং (Colour) : মেরুন রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১১ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১১ই অক্টোবর ১৯৭৬ সাল

৫০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে সিলেটের চা বাগানের মনোরম দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় ফুল, পাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ৫০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় তা এখানেও লক্ষণীয়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের নকশার ওপরে ৫০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৫২ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist’s Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১২ : পঞ্চাশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা মার্চ ১৯৭৬ সাল

১০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশে ১০০ (একশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের বামপাশে শোভা পাচ্ছে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রামবাংলার নদী ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক, স্পাইরাল ও লোকজ প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাস্তবধর্মীরূপে নদী-নৌকার দৃশ্য সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, লতাপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটে তার থেকে ব্যতিক্রম স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশ বিভিন্ন লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকেও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে। সংখ্যামানের নিচে বিভিন্ন প্যাটার্ন দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখা যায়। সিরিয়াল নম্বরে ইলেকট্রোটাইপ জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় নীল রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৬০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৩ : একশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১লা মার্চ ১৯৭৬ সাল

৫০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের বামপাশে শোভা পাচ্ছে তারা মসজিদের ছবি, অলংকরণধর্মী নকশায় পরিপূর্ণ।

বিপরীত দিক (Reverse) : বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের ছবি ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল ও জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে বাস্তবধর্মীরূপে সুপ্রীম কোর্টের দৃশ্য সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ভাসমান শাপলা ফুল, কাস্তে হাতে ধানের শিষ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় তা এখানে অনুপস্থিত। তবে সম্মুখভাগে আয়তকার ও বিপরীতপাশে অর্ধবৃত্তের সাদা ফর্ম তৈরি করা হয়েছে যা এ পর্যন্ত কোনো কাগুজে মুদ্রায় দেখা যায়নি। স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণের আধিক্য লক্ষণীয়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশ বিভিন্ন লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকেও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে। সংখ্যামানের নিচে বিভিন্ন প্যাটার্ন দ্বারা সজ্জিত।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের ছবি আয়তকার ফর্মে দেখা যায়। নোটের মাঝে ৫০০ সংখ্যা জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : নীল, সবুজ, পীতাভ খয়েরি ও লাল রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৭০ x ৬৯ মি.মি.

আকার **(Shape)** : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মাঝখানের সামান্য ডানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক লেখাটি নিরাপত্তা সুতায় মাইক্রোপ্রিন্ট করা।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : পাওয়া যায়নি।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব সেগুফতা বখ্‌ত চৌধুরী (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৪ : পাঁচশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৬ সাল

১৯৭৭ সাল

১০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ১০০ (একশত) টাকার কাগুজে মুদ্রার পুনরায় নতুন নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে তারা মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে বিখ্যাত লালবাগ কেল্লা ও চারপাশে নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ লোকজ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় অলংকরণধর্মী প্যাটার্নে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদ, লোকজ সূচিশৈলীর নকশা ও বিপরীত পৃষ্ঠে লালবাগ কেল্লার মনোরম দৃশ্য বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে লোকমোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলা সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে আড়াআড়িভাবে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের স্ট্রোকের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী কাগুজে মুদ্রাটিতে সাদা অর্ধবৃত্ত দেখা যায়। এ নোটে স্পাইরাল ফর্মের অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের ডানপাশে লাল রঙের লাইনের স্পাইরাল প্যাটার্নের নকশা এবং অপরদিকে লোকজ নকশা ও নকশি লাইনের বর্ডার দেখা যায় যা আকর্ষণীয়রূপে সজ্জিত হয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : মূলত নীল রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৬০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটে দৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তাচিহ্ন দেখা যায়।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটিতে স্বাক্ষর করেছেন মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন (গভর্নর)।

চিত্র ১৫ : একশত টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ সাল

১৯৭৮ সাল

৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৮ সালের ২রা মে বাংলাদেশে ৫ (পাঁচ) টাকার নতুন নকশার কাগুজে মুদ্রার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : মুদ্রার ডানপাশে নওগাঁর বিখ্যাত কুসুম্বা মসজিদের ছবি দেখা যাচ্ছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে পাট পাতাসহ কলকারখানার ছবি রয়েছে।

নকশা (Design) : নোটটি তুলনামূলক কম নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় গতানুগতিকতা রয়েছে। বর্ডারের নকশায় স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে। তবে হাফ সার্কেল প্যাটার্ন ব্যবহারে কম্পোজিশনে ভিন্নতা লক্ষণীয়।

সচিত্রকরণ (Illustration) : সম্মুখভাগে মসজিদের ও বিপরীত দিকে কলকারখানাসহ নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখভাগে মাছ, কুলা মোটিফের সাহায্যে নোটটি অলংকৃত। বিপরীতভাগে নকশি বৃত্ত ও স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে পাঁচ টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে চারপাশে বাংলায় ৫ এবং মধ্যভাগে বাংলায় পাঁচ টাকা লেখা। পেছনের ভাগে ডানপাশে বৃত্তের মাঝে বাংলায় ও ইংরেজিতে ৫, 5 সংখ্যামানটি লেখা।

অলংকরণ (Ornamentation) : মুদ্রাটি তুলনামূলক অন্যান্য মুদ্রার থেকে কম অলংকরণধর্মী। সম্মুখভাগে সাদা স্পেসের ব্যবহার বেশি তবে বিপরীতভাগে পুরো স্পেস জুড়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা

সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে মাছের ফর্মের নকশা এবং নিচের দুইপাশে বাংলা সংখ্যামান ৫ লেখা তার নিচে কুলার ফর্মের নকশা দ্বারা নোটটি সজ্জিত করা হয়েছে। বিপরীত দিকে ডানপাশে অলংকৃত বৃত্তের উপরে বাংলায় ও ইংরেজিতে সংখ্যামান লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। অন্য দুপাশ অর্থাৎ বামপাশে নিচের পাট গাছের ওপর সরাসরি সংখ্যামানগুলো লেখা হয়েছে। যা কম্পোজিশনে ভিন্নতা এনেছে।

জলছাপ (Watermark) : বৃত্তের মাঝে বাঘের মাথার জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় খয়েরি রঙের সংমিশ্রণ তবে পাট গাছের পাতাতে সলিড সবুজ রং দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১২০ x ৬৫ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের বামপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৬ : পাঁচ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২রা মে ১৯৭৮ সাল

১০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৮ সালের ৩রা আগস্ট বাংলাদেশে ১০ (দশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে আতিয়া মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে ধানক্ষেতে কৃষকের ধান কাটার দৃশ্য শোভা পাচ্ছে।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ১০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ১০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় মেরুন রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪০ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist’s Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নাজিরুদ্দিন আহমদ (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৭ : দশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৩রা আগস্ট ১৯৭৮ সাল

১৯৭৯ সাল

১ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ১ (এক) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার পরিবর্তন হয় এবং প্রচলনও করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : বামপাশের মধ্যখানে তিনটি তিলকিত হরিণ দেখা যাচ্ছে।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে বৃত্তের মাঝে জাতীয় প্রতীক শাপলা।

নকশা (Design) : পূর্বের নোটের নকশার তুলনায় এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। বর্ডারের সজ্জায় নতুনত্ব রয়েছে। বর্ডারের নকশায় জিওমেট্রিক ও স্পাইরাল প্যাটার্নের আদলে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির হরিণগুলো বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রার সম্মুখ ও বিপরীত দিকে স্পাইরাল এবং ডায়মন্ড প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়।

লিখনশিল্প (Lettering) : অলংকরণধর্মী টাইপোগ্রাফিতে এক টাকা সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। সামনের ভাগে একপাশের বর্ডারে বাংলায় ১ এবং তারপাশে ইংরেজি সংখ্যাতে '1' লেখা। তার নিচে কথায় এক টাকা লেখা রয়েছে যা একটি আয়তক্ষেত্রের মাঝে স্থাপিত। পেছনের ভাগে নিচের বর্ডারে বাংলায় ১ লেখা। তারপাশ থেকে একটি লম্বালম্বি স্ট্রিপে কথায় রিভার্সে এক টাকা লেখা, যা খুবই নান্দনিক।

অলংকরণ (Ornamentation) : সমগ্র কাগুজে মুদ্রাটির অলংকরণধর্মী বর্ডার, জাতীয় প্রতীকের চারপাশের অলংকৃত বৃত্তের বিন্যাস, উল্টা 'D' শেইপের একটি নতুন ফর্ম দেখা যায়। তার পেছনে হরিণের বিন্দু বিন্দু তিলের সুনির্দিষ্ট অলংকরণ দেখা যায়।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের উপরের একপাশে ফুলের মতো বৃত্তের ওপর ইংরেজিতে সংখ্যামান 1 লিখে তা সজ্জিত করা হয়েছে। অপরদিকে লম্বা স্ট্রিপে বাংলায় ১ লিখে অলংকৃত করা হয়েছে। ষড়ভুজের মাঝে বিপরীত পাশে বামে ও ডানে বাংলায় ১ লেখা রয়েছে। বাংলা ভাষার আধিক্য এখানে লক্ষণীয়। পূর্বের ১ টাকার কাগুজে মুদ্রাগুলোর ন্যায় চারপাশে বর্ডার দেখা যায় না। কম্পোজিশনে ভিন্নতা রয়েছে।

জলছাপ (Watermark) : উল্টো 'D' শেইপের মাঝে বাঘের বিশ্রামরত অবস্থায় বসা জলছাপ দেখা যায়।

রং (Colour) : হালকা বেগুনি, লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১০০ x ৬০ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের ডানপাশে স্থাপিত।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : তৎকালীন সময়ে এ কাগুজে মুদ্রার নকশা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : উল্লেখ নেই।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব আবুল খায়ের (অর্থ সচিব, বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৮ : এক টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সাল

পরবর্তী সময়ে তিনটি তিলকিত হরিণের নকশায় এক টাকার কাগুজে মুদ্রাটি ১ই মার্চ ১৯৮২ সাল, ১০ই জুন ১৯৮৩ সাল, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৮৫ সাল, ৩০ই জুন ১৯৮৮ সাল, ৩০শে মে ১৯৮৯ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ সাল, ৪ঠা মার্চ ১৯৯১ সাল, ১২ই জানুয়ারি ১৯৯২ সাল, ৮ই মে ১৯৯৩ সাল, ৩০ই মে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত একাধিকবার নকশার ও রঙের বিবর্তনের সমন্বয়ে তা মুদ্রিত হয়।

২০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ২০শে আগস্ট বাংলাদেশে ২০ (বিশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রথম প্রচলন করা হয়। এবং তার ধরনে পূর্বের ছাপা কাগুজে মুদ্রার তুলনায় কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : ডানপাশে ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি।

বিপরীত দিক (Reverse) : মুদ্রার বিপরীত দিকে রয়েছে বৃত্ত এবং আমাদের সোনালি আঁশ পাটের ধৌতকরণের দৃশ্য।

নকশা (Design) : এ নোটটি বেশ নকশাধর্মী। মুদ্রার সম্মুখে লোকজ ফুলের ও বিপরীত দিকে স্পাইরাল প্যাটার্নের ছোটো ছোটো মোটিফ লক্ষ করা যায়। নোটটি বেশ নকশাধর্মী।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটিতে গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের পাট ধৌতকরণের দৃশ্য ও মসজিদের ছবিগুলো বাস্তবধর্মীরূপে সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বর্ডারের নকশায় জ্যামিতিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে খালে পাট ধৌতকরণের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ২০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে সবুজ রঙের নকশার উপরে ২০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা ও সবুজ রঙে তবে সাদা আউট লাইনে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।

রং (Colour) : গাঢ় সবুজ রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।

মাপ (Size) : ১৪৬ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।

স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ১৯ : বিশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ২০শে আগস্ট ১৯৭৯ সাল

৫০ টাকার কাগুজে মুদ্রা

১৯৭৯ সালের ৪ঠা জুন বাংলাদেশে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার কাগুজে মুদ্রার নকশার প্রচলন করা হয়।

সম্মুখভাগ (Obverse) : এই নোটের সম্মুখভাগের ডানপাশে সাত গম্বুজ মসজিদের ছবি ও অন্যান্য নকশা।

বিপরীত দিক (Reverse) : নোটের পিছনে শোভা পাচ্ছে সিলেটের চা বাগানের মনোরম দৃশ্য ও নকশা।

নকশা (Design) : নোটটি বেশ নকশাধর্মী। সম্মুখভাগের বর্ডারের সজ্জায় পানপাতার নকশা রয়েছে তবে বিপরীতভাগের বর্ডারের নকশায় ইসলামিক প্যাটার্নের আদলে গতানুগতিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে।

সচিত্রকরণ (Illustration) : মুদ্রাটির সামনের পৃষ্ঠে মসজিদের ছবি, মাঝে রঙিন ফুলের ছবি ও বিপরীত পৃষ্ঠে চা বাগানের বাস্তবধর্মী ছবি সচিত্রকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন নকশা ও আলপনা দ্বারা নোটটি সজ্জিত।

মোটিফ (Motif) : মুদ্রাটিতে ফুল, পানপাতা, ইসলামিক মোটিফ ও স্পাইরাল প্যাটার্নের সাহায্যে অলংকৃত।

লিখনশিল্প (Lettering) : টাইপোগ্রাফি অলংকরণধর্মী। সামনের ভাগে চারদিকে বাংলায় ৫০ সংখ্যামান লেখা। বিপরীত পাশে ডানপাশে বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যামান উল্লিখিত। সাদা রঙের সাহায্যে তা আপ করা হয়েছে।

অলংকরণ (Ornamentation) : অলংকরণধর্মী তবে পূর্বের কাগুজে মুদ্রাগুলোতে যে সাদা বৃত্ত দেখা যায় এ নোটেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সজ্জিতকরণ (Decoration) : মুদ্রার সম্মুখভাগের চারপাশে লাল রঙের পানপাতার ওপরে ৫০ সংখ্যাটি লেখা হয়েছে সাদা রঙে। বিপরীত দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামটির নিচেও অলংকৃত স্ট্রিপ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা নান্দনিক।

জলছাপ (Watermark) : জলছাপে ডানদিকে তাকানো বাঘের ছবি দেখা যায়।
রং (Colour) : গাঢ় কমলা রঙের মিশ্রণ দেখা যায়।
মাপ (Size) : ১৫২ x ৬৯ মি.মি.

আকার (Shape) : আয়তক্ষেত্রাকার

নিরাপত্তা সুতা (Security Thread) : নোটের মধ্যখানে অদৃশ্যমান নিরাপত্তা সুতা রয়েছে।

শিল্পীর নাম (Artist's Name) : পাওয়া যায়নি।

প্রিন্টিং সংস্থা (Printing Press) : দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. (এসপিসিবিএল), গাজীপুর।
স্বাক্ষর (Signature) : নোটটি জনাব নুরুল ইসলাম (গভর্নর) কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

চিত্র ২০ : পঞ্চাশ টাকার কাগুজে মুদ্রা, প্রকাশকাল ৪ঠা জুন ১৯৭৯ সাল

১৯৮০ সাল

এ সালে উল্লেখযোগ্য কোনো নকশার পরিবর্তন ঘটেনি। তাই নতুন নোটের প্রচলন দেখা যায়নি।

সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও মুদ্রার সুরক্ষা ও জালিয়াতির প্রতিরোধে কয়েকটি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ মুদ্রাকে জাল থেকে রক্ষা করতে কয়েকটি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে বাংলাদেশ অর্থবিষয়ক কর্তৃপক্ষ রিপ্রোডাকশন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যা নিম্নরূপ :

- Thread
- Watermark
- Anti-copy Image
- See Through method
- Microprint
- Latent Image
- Optically variable Inks
- Blind Recognition

Thread : থ্রেড সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যা হলো : Solid Line Ges Star-burst effect. থ্রেডগুলো কাগজের মধ্যে এমবেড করা থাকে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েও যেতে পারে আবার তা স্টার বিস্ফোরণের প্রভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেখানে থ্রেডটি কাগজের অভ্যন্তরে ও তার বাইরে সাধারণত বুনতে দেখা যায়। তবে নোট হালকাভাবে ধরলে থ্র্যাডটি একটি শক্ত রেখা হিসেবে দেখা যায়। থ্রেড এমন বৈশিষ্ট্যসংবলিত উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়, যা স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মাইক্রোপ্রিন্টিং উপকরণ যুক্ত করা হয় যাতে অ্যান্টিভায়োলেট রশ্মির নিচে ফ্লোরসেস (গ্লো) দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুরক্ষা থ্রেডেও মাইক্রোপ্রিন্ট থাকতে পারে।

Watermark : বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটে তিনটি পৃথক মোটিফসহ পাঁচটি ভিন্ন জলছবি দেখা যায়। মোটিফগুলো হলো : বাঘের প্রতিকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও সংখ্যায় '500' এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো। পাঁচশত টাকার নোটে শুধু সংখ্যায় '500' এবং অন্যান্য নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের লোগো দেখা যায়।

Anti-copy Image : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যান্টি কপি চিত্রের রঙের কপির এবং ইলেকট্রনিক স্ক্যানারগুলো জাল নোটের হুমকির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। ব্যাংক নোটের উৎপাদক বা প্রিন্টারগুলো আবিষ্কারে নোটের অবজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রযুক্তির টাইপগুলো দ্বারা সহজেই রিপ্রোডাকশন করা হয় না। এন্টি অনুলিপি বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত জরিমানা দিয়ে গঠিত হয়। 'নকল' বা 'অকার্যকর' বৈশিষ্টগুলো কিছু শব্দের সাথে বিন্দু বা রেখাগুলো হস্তক্ষেপের প্রভাবগুলোতে গোপন বার্তাগুলো অনুলিপি করা।

See Through Method : নোটগুলো ব্যাক প্রিন্ট করতে ব্যবহৃত যথার্থ সরঞ্জামগুলো নোটগুলোর লিথো অংশের পিছনে এবং সামনের অংশটি একসাথে মুদ্রণ করতে সক্ষম করে। এগুলো একে অপরের সাথেও নিখুঁত নিবন্ধকরণ ক্ষমতাটি ব্যবহার করে। এটি দুটি পৃথক চিত্র সমন্বিত, একটি সামনে এবং অন্যটি পিছনে। নোটটি হালকা পর্যন্ত ধরে রাখা হয়। যা দুটি চিত্রের থাই সমন্বয়সহ তৃতীয় চিত্র তৈরি করা হয়।

Microprint : ক্ষুদ্র চিত্রগুলো নকশাতে তৈরি হয়ে যায় এবং উভয়ই ইন্টিগ্লিও এবং লিথো মুদ্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা মুদ্রিত করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদি সমস্ত কৌশল জাল না হয় তবে এই ক্ষুদ্র বার্তাগুলো হারিয়ে যায়, তাই সেইক্ষেত্রে তারা আরও ভালো সুরক্ষা দেয়।

Latent Image : প্রচ্ছন্ন চিত্রগুলো ইন্টিগ্লিও মুদ্রণ দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং তারা যে সুরক্ষা সরবরাহ করে তা সরাসরি ইন্টিগ্লিও প্রিন্টের স্বচ্ছ প্রকৃতির ফলাফল। যখন সরাসরি দেখা হয়, একটি সুপ্ত চিত্র কিছু ভাঙা রেখা ছাড়া কিছুই প্রকাশ করে না এবং যদি আপনি ঘনিষ্ঠভাবে তাকান তবে তা হয়! তবে এক ঝলক কোণে একটি চিত্র প্রদর্শিত হবে। Appears এটি ইন্টিগ্লিও প্রিন্টের ফলাফলটি কাগজকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বৈপরীত্য তৈরি করার ফলাফল।

Optically variable Inks : অপটিক্যালি ভেরিয়েবল কালি বা ওভিতে বিশেষ ফিল্মের ছোট ছোট ফ্লেক্স রয়েছে, যা দেখার কোণটি বৈচিত্র্যযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে রং পরিবর্তন করে ফলাফল দেখার কোণটির প্রকরণ অনুসারে কালির পরিবর্তিত রং। এগুলোর খুব ছোট অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এটি কখনো কখনো সিল্ক স্ক্রিন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মুদ্রিত হয়।

Blind Recognition : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রায়শই একই আকারের বা প্রায় একই আকারের নোটগুলোর মধ্যে দুটি পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। এগুলি তাদের সহায়তার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি বিকাশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই বিভিন্ন রঙে মুদ্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট পাঁচটি বিন্দু ১০০০ টাকার নোটে ব্যবহৃত হয়, চারটি বিন্দু ৫০০ টাকার নোটে ব্যবহৃত হয়, তিনটি বিন্দু ১০০ টাকার নোটে, দুটি বিন্দু ৫০ টাকার নোটে এবং একটি বিন্দু ২০ টাকার নোটে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত বিন্দগুলো বিজ্ঞপ্তিযুক্ত এবং উপরের ডানদিকে স্থাপন করা হয়। এটা নোটের কোণে থাকার ফলে হাতের স্পর্শে তা অনুভূত হয়।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত একটি ১০০০ টাকার কাগুজে মুদ্রায় চিত্রের সাহায্যে সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো :

চিত্র ২১ : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপা পোস্টার থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশে সেই ১৯৭২ সাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন মূল্যমানের কাগুজে মুদ্রার প্রচলনভাগ নোটই ব্যাংকনোট তবে কিছু সরকারি নোট হিসেবে প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে মুদ্রণের ক্ষেত্রে ভারত, ইংল্যান্ড ও বর্তমানে বাংলাদেশেই নোটগুলো মুদ্রিত হচ্ছে। ১৯৭২ সালে ২০ টাকা বা ৫০ টাকার কোনো নোট ছাপা হয়নি। ১০০ টাকার নোট দুটি ছাপা হয়; যার প্রথমটির প্রচলন হয় ৪ঠা মার্চ ১৯৭২। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক নোট বলে ধারণা করা হয় তবে তা প্রচলনের তারিখের ভিত্তিতে।

চিত্র ২২ : বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত বাংলাদেশের প্রথম কাগুজে নোট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সংবলিত মোট ছয়টি কাগুজে মুদ্রা ১৯৭২ সালে প্রথম ছাপা হয়। তবে ৫ টাকার নোটটি কয়েকবার অবমুক্ত করা হয়েছে। তেমনি ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকারও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নকশায় অবমুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমাদের এ কাগুজে নকশার স্থায়িত্ব বা সময়কাল নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে মানের বিপর্যয় ঘটে। সময়ের সাথে সাথে কখনো এর ছন্দপতনও ঘটে। তবে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাংলাদেশের কাগুজে মুদ্রার নকশা ধীরে ধীরে আরো স্বীয় স্থানে বলীয়ান হবে।

তথ্যসূত্র

মোহাম্মদ আলী খান (২০২০)। *ডাকটিকিট ও মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহা. মোশাররফ হোসেন (২০১৪)। *আদি ঐতিহাসিক মুদ্রার ইতিহাস।* দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

বুলবুল আহমেদ (২০১৩) । *বাংলাদেশ ব্যাংকের স্মারক মুদ্রা ও নোট।* টাকা জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

কালের সাক্ষী, টাকা জাদুঘরের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।

BD Chattopadhya (1977) Currency in Early Bengal, *Journal of Indian History,* LV.

Siddique Mahmudur Rahman, M Muhibullah, Md Jahirul Islam, Sayed Bin Salam, Arup Kumar Shaha & Abdus Samad (2011) *Cowri To Taka, Triune-*Monitor Publications, Dhaka.

Sirajul Islam (2007) *Taka,* Banglapedia, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

কাগজের কারুশিল্প

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন*

সারসংক্ষেপ : শিল্পচর্চা নদী ও সাগরের স্রোতধারার মতোই। যে কোনো বিষয়ে এই শিল্পচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কারুশিল্প চর্চার মাধ্যম হলো কাগজ। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে এটা অন্যতম। কাগজের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এদেশে তেমন কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। এই কাগজের কারুশিল্প সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এর বিবর্তন, মোটিফ, শিল্পসৌকর্য, ব্যবহার উপযোগিতা, করণকৌশল ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এদেশের জনগণের উৎসবপ্রিয়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ অঞ্চলের কাগজের কারুশিল্পগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে, তা প্রমাণিত হয়েছে।

সেই আদিম যাযাবর জীবন থেকে আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে কারুশিল্পের নানান জিনিস, সামগ্রীর সম্মিলন ঘটেছে। এইসব কারুশিল্পকে নতুন নতুন মাধ্যমের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে কাগজও যুক্ত হয়েছে কারুশিল্প নির্মাণে। অবশ্য কাগজ নিজেও একটি কারুশিল্প সামগ্রী। কাগজ হলো একটি সেলাইবিহীন Non woven বস্তু। যা মূলত গাছের কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত হয়। প্রধানত কাঠ, বাঁশ, ঘাস, পুরোনো কাগজ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি কাগজ তৈরির উপাদান। লিখবার ধারণা থেকে মানুষ কাগজ ব্যবহার করে। পরে ছবি আঁকার জন্য অথবা কোনো কিছু মোড়ানোর জন্য ব্যবহার হয়। এখন সাদাসহ রংবেরঙের কাগজ তৈরি হলেও প্রথম দিকে শুধু সাদা কাগজ তৈরি হত (হোসেন, ২০১৯ : ৮)।

প্রথম কাগজ তৈরির প্রসেস লিপিবদ্ধ হয় চীন দেশে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫-২২০ সালে ইস্টার্ন হান-এর আমলে (হোসেন, ২০১৯: ৮)। কাগজ হচ্ছে ফারসি শব্দ। কাগজের ইংরেজি শব্দ 'Paper' প্যাপিরাস শব্দ থেকে এসেছে। প্যাপিরাস গাছের বাকল থেকে এই

* সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্যাপিরাস তৈরি হয়। প্রাচীন চীনে দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হান জাতির চাই লুন নামের একজন মণ্ড দ্বারা তৈরি কাগজ আবিষ্কার করেন। চীন দেশেই সর্বপ্রথম কাগজের আবিষ্কার ও ব্যবহার হয়েছিল (রাব্বি, ২০০২ : ২)।

কাগজের প্রচলন চীন থেকে ধীরে ধীরে তিনশো শতাব্দীতে ভিয়েতনামে, পাঁচশো শতাব্দীতে জাপানে, আটশো শতাব্দীতে মুসলিম দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে (হোসেন, ২০১৯ : ৮)। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ মধ্যযুগে ইউরোপে কাগজ তৈরি শুরু হয়। এখানে সর্বপ্রথম পানি চালিত কাগজ উৎপাদনের কাগজকল ও কলকব্জা বা মেশিন আবিষ্কার ও নির্মাণ করা হয়। ১৫৮৮ সালে ব্রিটেনে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে পেপার মিলে কাগজ উৎপাদন শুরু হয় (হোসেন, ২০১৯ : ৮)।

ব্রিটিশ ভারতে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের কাগজ কলের প্রতিষ্ঠা হয়, যেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল চিটাগড়ের কাগজ কল। শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম ১৮২০ সালে কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য বাস্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়েছিল (ইসলাম, ২০০৩ : ২২৬)। বাংলাপিডিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল-এ দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হতো মেস্তা (একপ্রকার দেশি শণ) এবং পাট গাছ থেকে। কয়েক প্রকার কাগজ প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে আফসানি ও তুলোট কাগজ উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত তুলা থেকে এই তুলোট কথাটি এসেছে" (ইসলাম, ২০০৩ : ২২৬)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে কর্ণফুলি কাগজ কল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস ও পাবনায় নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব কলে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের কাগজ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়াও হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন থেমে নেই।

কাগজ আবিষ্কার সভ্যতার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে শিল্প, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দ্বার সবার জন্য উন্মোচিত হয়। কাগজ মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। বড়, ছোট, পুরু, মোটা, পাতলা ইত্যাদি নানা রকমের এবং নানাবর্ণের বা নানা টেক্সচারের কাগজ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে নানারকমের কারুশিল্প তৈরি হয়—পুরোনো কাগজজাত দ্রব্য, খেলার তাস, কাগজজাত মনোহারী, বই বাঁধাই, প্যাকেজিং, মুদ্রণ ব্লক তৈরি, কাগজের ব্যাগ, টিস্যু, বিভিন্ন ধরনের কাগজের ফুল ইত্যাদি।

কাগজের কারুশিল্প দুভাবে তৈরি হয়-(১) হাতে তৈরি (Manual) (২) যন্ত্র দ্বারা

তৈরি (Machine Made)। কাগজের তৈরি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর শিল্পিত রূপায়ণই হলো কাগজের কারুশিল্প। কাগজের কারুশিল্প ব্যবহারিক দিক দিয়ে সবার মনে সৌন্দর্যবোধের সঞ্চার করে। এই শিল্পের বড়ো অংশ জুড়ে আছে অরিগামি। অরি মানে ভাঁজ করা, গামি মানে কাগজ, আর অরিগামি হলো কাগজ ভাঁজ করে করে শিল্পসম্মত ডিজাইনে তৈরি করা জাপানি কাগজের কারুশিল্প (আইচ, ২০১৯:৮৮)। এটি জাপানে বহুল পরিচিত। শুধু কাগজ ভাঁজ করে অসংখ্য খেলনা, পশুপাখি, মানুষের মুখ ও মুখোশ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। যখন কাগজ ছিল না তখন কাপড়ের তৈরি অরিগামির ন্যায় বহু কিছু দেখা যায়। আকিরা যোশীবাওয়া বা ইয়োশিকাওয়া আকিরা[১] কয়েক হাজার অরিগামি মডেল রেখে গেছেন। কাগজ ভাঁজ করে করা তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি পৃথিবী বিখ্যাত (অরূপচন্দ্র, ১৯৯৮ : ২৮-২৯)।

কারুশিল্পের সৃষ্টি ও কলাকৌশল প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ বোয়াসের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন : "Productive artists are found among those who have mastered a technique" (আলম, ১৯৯৯ : ৪২)। কাগজ দিয়ে তৈরিকৃত কারুশিল্পের করণকৌশল সহজ, উপকরণও সহজলভ্য। কাগজ, কাঁচি, আঠা এই তিনের সমন্বয়ে অনেক কারুখচিত নানা রকম মোটিফ করা যায়। এই সজীব অলংকরণের মূল প্রেরণা হলো প্রকৃতি। এখান থেকেই তৈরি হয় বিশেষ ও নিখুঁত দৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির ফুল, ফল, পাতা, পাখি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নৌকা, পানি, ঘরবাড়ি ইত্যাদিতে আকারগত সূক্ষ্মতা দেখা যায়। প্রকৃতি তার বিরাট কারু ঐশ্বর্য সাজিয়ে বসে আছে তা থেকে কাগজের কারুশিল্পীরা নিজের মতো করে চরিত্রগত গুণ বজায় রেখে সহজভাবে ভাগ করে প্রকাশ করে। উপকরণ ও উপকরণের অন্তর্গত নকশার চয়ন এবং কাগজের কারুশিল্প তৈরিতে এর অনিবার্য প্রয়োজন। এ শিল্পের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। এমন সমীকরণে বাংলাদেশে যেসব কাগজের কারুশিল্প তৈরি হয়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নৌকা, উড়োজাহাজ বা রকেট, শাপলা, পাখি

কাগজের তৈরি কারুশিল্পের মাধ্যম কাগজ, যা দিয়ে সহজেই কিছু না কিছু করা যায়। প্রায় সব মানুষই জীবনে কোনো না কোনো সময়ে কাগজের নৌকা তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কাগজকে আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে নৌকা বানানোর এই অভিজ্ঞতা বিশ্বজয়ের মতো। তারপর তাকে বৃষ্টির পানিতে ভাসানো, যেন এক রোমাঞ্চকর কারুশিল্পে রূপ নেয়। কাগজের উড়োজাহাজ বা রকেট শৈশবের গতিময়তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কাগজ দিয়ে সহজভাবে তৈরি করা উড়োজাহাজ বা রকেট শূন্যে ছুড়ে ওড়ানোর অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানমনস্ক অনুভূতি। কাগজ দিয়ে জাতীয় ফুল শাপলাকে নির্মাণ যেন জাতীয়তাবোধের প্রথম পাঠ। শাপলা পানিতে ভাসে। কাগজের শাপলা তৈরির

মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক এদেশের পানির সাথে সম্পর্কের যোগসূত্র ঘটে। কাগজের পাখি তৈরি যেন ওড়ার বাসনাকে বিভোর করে তোলে। এককথায় কল্পনাকে উসকে দিতে এদের জুড়ি নেই। কাগজ দিয়ে অনেক ধরনের পাখি তৈরি করা যায়। বংশপরম্পরায় এই কার্যক্রমটি চলছে।

কাগজের মণ্ড

ফরাসি পাপিয়ের মাশ বা পেপার মাসে এই শব্দটির তরজমা হলো 'চিবানো কাগজ' (আইচ, ২০০৯ : ২৬৫)। পাপিয়ের মাশ বা কাগজের মণ্ড[২] ব্যবহার করে ফ্রি স্ট্যান্ডিং কারুশিল্প, রিলিফ, টেক্সচার, বিভিন্ন লেয়ার বা স্তরে ইচ্ছেমতো কাজ করা যায়। এটি এমন একটি উপাদান যা খুব সহজেই চাহিদা অনুযায়ী আকার আকৃতি প্রদান করা সম্ভব। সেই সঙ্গে রং করতে চাইলে সহজেই তা রং করা যায়। ছাঁচ তৈরি করে তাতে কাগজের মণ্ড ব্যবহার করে বেশি মাত্রায় উৎপাদনের সুযোগ পাওয়া যায়। কমল আইচ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, "অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে আসবাবপত্রের ছোট ছোট জিনিস এবং সজ্জাদ্রব্য বানাতে পাপিয়ের মাশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত" (আইচ, ২০০৯ : ২৬৬)। যদি কারুশিল্পটি আকারে বড়ো হয় তাহলে একটু মোটা তারের আর্মেচার[৩] ব্যবহার করার দরকার হয়। আকারটা ছোট হলে প্রাথমিক আকারটা একটু শক্তপোক্ত হওয়া দরকার যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কাগজ বা মণ্ডের আস্তরণ লাগানোর সময়ে এটা চুপসে না যায় (Mattil, 1962: 95)। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ধীরে ধীরে অভিপ্রেত রূপটি তৈরি হয় তেমনি এর ফলে কাঠামোটিও শক্তিশালী হয়। পরে এতে রং করারও সুযোগ থাকে।

মুখোশ

'মুখকোশ' শব্দ থেকে মুখোশ[৪] শব্দটি উৎপন্ন (চক্রবর্তী, ২০০৫ : ৪৪৩)। নানা উপকরণে মুখোশ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে কাগজ অন্যতম। কাগজ ও কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ নির্মাণ করা হয়। সাধারণত কাগজের মণ্ড ছাঁচে ফেলে মুখোশ তৈরি করা হয়। পরে তার উপর রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। দেব-দেবী, জীবজন্তু ও মানুষের মুখাকৃতি কাগজের মাধ্যমে সরল বা সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়। কোনো কোনো মুখোশ নানান রঙে চিত্রিত করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই মুখোশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ১লা বৈশাখে বর্ষবরণে মঙ্গল শোভাযাত্রায় কাগজের মুখোশের ভূমিকা অনেক।

পুতুল

বাংলাদেশের কারুশিল্পের মধ্যে পুতুল খুব জনপ্রিয়। ঐতিহ্যময় পুতুল বিয়ে শৈশবের

এক আবেগীয় ঘটনা। কাগজ বা কাগজের মণ্ড দিয়ে কখনো হাতে, কখনো ছাঁচে ঐতিহ্যবাহী কায়দায় পুতুল তৈরি হয়। কোনো কোনো পুতুলকে নানা রঙে চিত্রিত করা হয়। কাগজের মণ্ড ছাড়াও নানা রকমের কাগজ দিয়েও পুতুল তৈরি হয়। "পুতুল কখনো মানুষের আকৃতি, কখনো পশু পাখির আকৃতি বা কখনো গাড়ি, পালকি, নৌকা প্রভৃতি ফিগারে প্রস্তুত হয়" (সিরাজুদ্দিন, ১৯৮৫ : ৫৮)।

কাগজের কোলাজ

একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরিতে নানা ধরনের ও নানা রঙের কাগজ, কাগজের ক্লিপিং, কাগজের টুকরা, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এইসব কাগজ দিয়ে একটি ছবি বা কাগজের কারুশিল্প তৈরির জন্য কোলাজ[৫]- এর একটা রূপকে বোঝাতে 'পাপিয়ের কোলে'[৬] শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দশম শতাব্দীতে চীনে এ ধরনের আবিষ্কারকে জনপ্রিয় বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (আইচ, ২০০৯ : ২৬৫)। কোলাজের কৌশলগুলো ২০০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনে কাগজ আবিষ্কারের সময় প্রথম দেখা যায়। কোলাজের ব্যবহার দশম শতাব্দী পর্যন্ত জাপানে খুব সীমিত পর্যায়ে বিশেষ করে হস্তলিপি শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোলাজের প্রচলন হয় (রহমান, ২০০৯:৬১)। ফরাসি শব্দ Coller থেকে কোলাজ শব্দের উৎপত্তি। কাগজের কোলাজ হলো কাগজ টুকরো ক্যানভাস বা অন্য কোনো ধারকে আঠা দিয়ে লাগানোর মাধ্যমে কোনো ছবি বা শিল্পকর্মকে প্রকাশ ও কিছু তৈরি করা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটি চারু ও কারুশিল্পে একটি বিপ্লবের মতো ছিল। কাগজের কোলাজ আধুনিক শিল্পকলায় একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট

খাম, ঠোঙা, ব্যাগ, প্যাকেট নিত্য ব্যবহার্য অনুষঙ্গ। যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দোকান থেকে নানান রকম জিনিস ক্রয় করা হয়। দোকানিরা এসব ক্রয়কৃত জিনিস কাগজের ব্যাগ কিংবা ঠোঙায় দিয়ে থাকে। ব্যাগ, ঠোঙা ও প্যাকেট বিভিন্ন সাইজের হয়। যেমন কম জিনিসের জন্য ছোটো ব্যাগ বা ঠোঙা, আবার বেশি জিনিসের জন্য বড়ো ব্যাগ বা ঠোঙা। এগুলো বিভিন্ন মনোরম রঙে হয়। কখনো কখনো এগুলোর গায়ে চিত্রিত করা হয়। চিঠিপত্র কিংবা দরকারি কাগজপত্র কোথাও পাঠাতে ব্যবহার করা হয় খাম। এগুলোও বিভিন্ন আকার ও রঙের হয়ে থাকে। প্যাকেটের ক্ষেত্রেও ঔষধের প্যাকেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকের কাগজের প্যাকেট তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে আর্ট কার্ড বা কিছুটা মোটা কাগজ ব্যবহার করা হয়। এগুলো করতে অনেকটা হাতের পাশাপাশি যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এর জমিনে হাতে, স্ক্রিন প্রিন্টে বা প্রিন্টিং প্রেসের সাহায্য নেওয়া হয়। এগুলো স্ব-স্ব

কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কাগজের বাক্স তৈরির ক্ষেত্রে কার্টন বা কার্ড বোর্ড ব্যবহার করা হয়। কমল আইচ বলেন, "কার্ড বোর্ড হলো সেলুলোজ ফাইবার বা উড পাল্প থেকে তৈরি বিভিন্ন থিকনেস- এর রকমারি কাগজের সাধারণ নাম" (আইচ, ২০০৯ : ১১০)। বাজারে গিয়ে দেখা যায় দুই ধরনের কার্ড বোর্ড আছে-সাধারণ কার্ডবোর্ড এবং আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড[৭]। এগুলো চাহিদানুযায়ী সংগ্রহ করে বাক্সসহ নানা ধরনের কারুশিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ঘুড়ি

কাগজের ঘুড়ি, ছোটো-বড়ো সবার আকর্ষণীয় দেশজ খেলনা। আকাশে মনের আনন্দ ছড়িয়ে দেয় এই ঘুড়ি যা সুতোর সাহায্যে উড়ানো হয়। তোফায়েল আহমদ *লোকশিল্প* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "চঙ্গ, পেটকাটা, ডাববাস, পতঙ্গা, তেলেঙ্গা বাক্স প্রভৃতি নামে বিভিন্ন আকৃতির এসব ঘুড়ি হয়ে থাকে। এ ঘুড়ি রং তুলি দিয়ে, কাঠের ব্লকের ছাপ মেরে অথবা কাগজ কেটে অলঙ্কৃত করা হয়। গৌরীপুর অষ্টমীর মেলায় ময়ূর ও বাঘের ছাপ চিত্র সম্বলিত পেট কাটা ঘুড়ি প্রভৃতির প্রচুর আমদানি হয়" (আহমদ, ১৯৮৫ : ৫৭-৫৮)। মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় জানা যায় বছরের সব সময়ই কমবেশি ঘুড়ি উড়ানো হয়। তবে শাকরাইনকে ঘিরে ঘুড়ি উৎসবে পরিণত হয়। এই উৎসবে বিশেষ করে পুরান ঢাকায় শত শত ঘুড়িতে আকাশ ঢেকে যায়। সাদা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি। সবুজ নানা রঙের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি তৈরি করা হয়। দেখা যায় প্রতিযোগিতার ঘুড়িতে লেজ থাকে না। ওয়াকিল আহমদের *লোকসংস্কৃতি* বইতে উল্লেখ আছে যে, "চৈত্র্য মাসে দিন ধার্য করে এই প্রতিযোগিতা হয়। হিন্দু সমাজে মকর সংক্রান্তি ও বিশ্বকর্মার দিনটিকে 'ঘুড়ি-দিবস' বলে গণ্য করে ঘুড়ি ওড়ানো হয়" (আহমদ, ২০০৭ : ১৪৫)।

ফানুস

ফানুস বা আকাশ- লন্ঠন হলো কাগজে তৈরি একটি ছোট উষ্ণ বায়ু বেলুন। সিনোলজিস্ট জোসেফ নিধামের মতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনারা যুদ্ধের সময় সংকেত প্রদানের লক্ষ্যে ছোটো ছোটো উষ্ণ বায়ু বেলুন নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করেছিল। খ্রিষ্টানরা বড়োদিনে স্টার অফ বেথেলেহেমের প্রতীক হিসেবে আকাশে ফানুস ওড়ায় যা নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে আসে। বাংলাদেশে কবে, কখন, কোথায় এটা শুরু হয়েছে তা ঠিক বলা যায় না, তবে বৌদ্ধদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফানুসের আকৃতি যেন মহাজাগতিক কোনো উপাদান। আগুনের সংস্পর্শে এলে কিছু সময় ওড়ার পরে অজানা আকর্ষণে মিলিয়ে যায়। লাল, নীল, হলুদ, সাদা ইত্যাদি রঙের কাগজের তৈরি ফানুসের ভিতর হতে মৃদু পবিত্র আলোকছটা বিকীর্ণ করে

এ শিল্প আরও মহিমান্বিত হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধগণ ফানুস উড়িয়ে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করে। এছাড়াও এদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এখন ফানুস ওড়াতে দেখা যায়।

কার্ড

কাগজের কারুশিল্প হিসেবে কার্ডের সামাজিক ভূমিকা রয়েছে। কার্ডের আদানপ্রদান মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে, ভালোবাসা জাগ্রত করে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, জাতীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের কার্ডের আদানপ্রদানের ব্যাপকতা রয়েছে। এই ডিজিটাল যুগেও এর আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। হাতে তৈরি কার্ড, তার একটা শৈল্পিক গুণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে কাগজের কার্ড এর নকশা, চিত্রণ, আকার, আকৃতি বাংলাদেশকেই উপস্থাপন করে।

বিয়ে, জন্মদিন, জাতীয় অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত কাগজের কারুশিল্প

বিয়ের অনুষ্ঠানে রঙিন কাগজ দিয়ে বা কেটে কেটে বিভিন্ন রকমের কারুময় নকশা করা হয়, যা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ। এই অনুষ্ঠানে কাগজের নকশার মূল সূত্র হচ্ছে Repeatation বা পুনরাবৃত্তি। এছাড়াও কাগজে প্রয়োজনানুযায়ী রংতুলি দিয়ে নকশা চয়ন করা হয়। এই নকশাগুলো মূর্ত-বিমূর্ত হয়ে থাকে। কখনো কখনো ধর্মীয় সংকেতের ব্যবহারযুক্ত। জন্মদিন পালনের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে এই দেশে। এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়। একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কারুখচিত কাগজের কারুশিল্প ব্যবহার হয়। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানকে সাজানোর ক্ষেত্রে কাগজের কারুশিল্পের জুড়ি নেই। কাগজের মুকুট, ঝালর, ফুল, মাছ, পাখি, ত্রিকোণাকৃতি নিশান সদৃশ, মুখোশসহ নানা অনুষঙ্গ যুক্ত করা হয়। এই কাগজের নকশাগুলো ছন্দের সমতা আনে। উৎসবকে নির্দিষ্ট ধারায় রাঙিয়ে তোলে। বিয়ে, জন্মদিন, জাতীয় অনুষ্ঠানের উৎসবপ্রিয়তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাগজের কারুশিল্পগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

মিশ্র মাধ্যমে কাগজের কারুশিল্প

মাঠকর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় অনেক কারুশিল্প মিশ্র মাধ্যমে হয়। শোলা, কাগজ, কাপড়, শলা, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়। শোলার সাথে কাগজ, কাপড়ের সাথে কাগজ বা অন্য মাধ্যমের সাথে কাগজ যুক্ত হয়ে, নতুন মাত্রার এবং দৃষ্টিনন্দন কারুশিল্প নির্মিত হয়। সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। *লোকসংস্কৃতি* গ্রন্থের বর্ণনা থেকে প্রসঙ্গটি অনুধাবন করা যায়, "বাড়িতে কোন বড়

ধরনের অসুখ হলে অথবা ঘোর বিপদ দেখা দিলে কলা গাছের খোল বা বাকলের ভেলায় খোয়াজ খিজিরের নামে বেরা (ভেলা) ভাসানো হয়। লাল, নীল কাপড় বা রঙিন কাগজে সাজানো ভেলায় থাকে খোয়াজ খিজিরের নামে শিরনি, পাঁচটি প্রদীপ ও তামার পয়সা" (আহমদ,২০০৭ : ৩৩৮)। ময়মনসিংহে এবং উত্তর বঙ্গে আচারটির প্রচলন আছে। "মনসা পূজাকে উপলক্ষ করে বাঁশের শলা, কাগজ, শোলা, রং প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন নকশায় মনসার মেড় তৈরি হয়। পূজা শেষে মেড় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়" (আহমদ,২০০৭:১৯৩)। এই গ্রন্থে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, "শোলা নির্মিত হাতপাখা গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে ঘরে টাঙানো হয়। এ জাতীয় পাখা তৈরির জন্য প্রথমে শোলার পাত পরস্পরের সাথে জুড়ে গোলাকার একটি পাখা বানানো হয়। এরপর পাখার জমিনের উপরে কাগজ কেটে ফুল-পাতার মোটিফ তৈরি করে এঁটে দেওয়া হয়"(আহমদ, ২০০৭ : ১৬৪)।

এছাড়াও কাগজ লিখতে, চিত্র অঙ্কনে, ছাপাতে, দ্রব্যের মোড়ক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। চিঠি, বই ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন সাধিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। যেসব অ্যাপ্লায়েড আর্ট গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় কাগজের কারুশিল্প সে অনুযায়ী এটা ডেকরেটিভ আর্ট বা আলংকারিক শিল্প। কাগজ দিয়ে গৃহসজ্জার জন্য তৈরি বিভিন্ন ধরনের নকশা, ফর্ম, ল্যাম্পসেড, কলমদানি, আয়না ইত্যাদি অপরিহার্য জিনিস। হালখাতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে কাগজের নানারকম কারুশিল্প ব্যবহৃত হয়। ফুল, লতা, পাতা, প্রাণী ও জ্যামিতিক এবং কাল্পনিক নকশার বিচিত্র সমাহার ঘটে এসব অনুষ্ঠানে। নকশি কাঁথার মোটিফ[৮] ও আল্পনার মতো সৃষ্টিধর্মী বিকাশে কাগজ এক মনোরম মাধ্যম। পান পাতা, আমপাতা, হিজলপাতা, প্রজাপতি, হাতি, ঘোড়া, পাখি, কুমির, মাছ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, মনোরম ঝালর প্রভৃতি নকশাসংবলিত বিচিত্র ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। অধিক ব্যবহৃত কাগজের কারুশিল্প হিসেবে মালা, চেইন, নিশান যেকোনো সজ্জার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে। কাগজের দৃষ্টিনন্দন সাপ, নৌকা, পালকি, চরকি, গাড়ি ইত্যাদি শিশু খেলনাও শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য অন্যতম আকর্ষণ ও আনন্দ বর্ধন করে। বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ অর্থাৎ বর্ষবরণে যে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় তার প্রধান উপকরণ বাঁশ এবং কাগজ। কাগজ ছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রা কল্পনা করা যায় না। কাগজের কারুশিল্প এখানে এসে পূর্ণতা পায়।

প্রত্যেক জাতির আলংকারিক কাজে জাতিগত একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কাগজের কারুশিল্প এর প্রভাবমুক্ত নয়। আলংকারিক পরিকল্পনায় পদ্মের স্থান সর্বাগ্রে। এই মোটিফটি নকশি কাঁথা থেকে শুরু করে কাগজের কারুশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। তারপর

আম পাতা, অশ্বত্থ পাতা, ফার্ন পাতা, লতা-ফুল-ফল, পাখি আয়না, চিরুনি, হাঁড়ি বাসন, সরতা, কাঁচি, দাও, বটি, কুলা, ঢেঁকি ইত্যাদি সুলভ মোটিফের ব্যবহার হয়। সর্বোপরি যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র তারই প্রতিফলন হয় কাগজের কারুশিল্পে। বিভিন্ন রঙের কাগজ বা রং দিয়ে কাগজের পটে প্রয়োগ করে বহু চর্চার ফলে বহুমাত্রায় আয়ত্ত করা হয় এই শিল্প। প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে। সেই নিজস্ব বা ব্যক্তিগত রুচি থেকেই প্রতিটি কাগজের কারুশিল্পে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আসে। গ্রাম এবং শহরের ছেলে-মেয়ে বা নারী-পুরুষ উভয়ই কাগজের কারুশিল্পী। এদের তৈরি কাগজের কারুশিল্পের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগসূত্র রয়েছে। প্রথম দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, নিজস্ব প্রয়োজনে, শিশু, প্রিয়জন বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনে বা উপহার সামগ্রী হিসেবে তৈরি হতো। এখানে মূল বিষয় ছিল সৌন্দর্যবোধের অনুভূতিকে প্রকাশ, বাণিজ্য নয়। পাশাপাশি মেলা, হাট, বাজার, শহরকেন্দ্রিক দোকানে কেনাবেচা হতো। এখানে শৈল্পিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে বাণিজ্যিক দিকটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যিক সামগ্রী হিসেবেও কাগজের কারুশিল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে সামগ্রী হিসেবে চাহিদা বাড়ায় বাণিজ্যিক কাগজের কারুশিল্পের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়াও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় অন্যান্য সামগ্রীর সাথে। এদিকে ভোক্তাদের জীবনধারার চাহিদা, রুচিমাফিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে গড়নে, নকশায়, ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনা হয়। হস্তগত কৌশলের সঙ্গে যান্ত্রিক কৌশলও সংযোজন হয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্যিক কাগজের কারুশিল্পের দ্রুত রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তর ধারা প্রবহমান যা বয়ে চলে ভবিষ্যৎ থেকে ভবিষ্যতে।

সম্ভাবনাময় এই কারুশিল্প অবহেলার মধ্য দিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে। লোকায়ত জ্ঞানকে পুঁজি করেই এই পথ চলা। হয়তো দু-একটি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোগে এর প্রশিক্ষণ বা প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান করছে। এটা একদমই অপ্রতুল। এর জন্য প্রয়োজন গবেষণা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিত্তবানদের সুদৃষ্টি। কতকিছু করার আছে এই শিল্পকে নিয়ে; কাগজের কারুশিল্প সংগ্রহশালা, এ শিল্প সম্পর্কিত ডিজাইন ব্যাংক তৈরিকরণ, এ শিল্প নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের যথাযথ মর্যাদা দেয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়টি পড়ানো, বিসিক কর্তৃক এ সম্পর্কে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া ইত্যাদি। তবে আশার আলো উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কারুশিল্প বিভাগে বি.এফ.এ সম্মান পর্যায়ে 'কাগজ ও কোলাজ শিল্প'[৯] নামে একটি কোর্স শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। এম. এফ. এ প্রোগ্রামে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে। এম. ফিল. বা পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামেও কোনো গবেষক গবেষণা করতে পারবেন।

পরিশেষে বলতে হয় বাংলাদেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু একইভাবে চাকরির সুযোগ বাড়ছে না। অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছে। বেকারত্বের কারণে নেমে আসছে হতাশা। ফলে সমাজে তৈরি হচ্ছে নানা রকম সামাজিক সমস্যা। এজন্য দরকার নতুন ধরনের আয়ের উৎস খুঁজে বের করা। অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করা, উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। মাঠ পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণকল্পে কাগজের কারুশিল্প উল্লেখযোগ্য পণ্য হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। কাগজ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি একটি সৃষ্টিশীল কাজ। পরিবেশ উপযোগী এই মাধ্যমটি পাওয়া যায় খুবই সহজে। সবচেয়ে বড়ো কথা সহজে তৈরিকৃত কাগজের কারুশিল্প সবার জন্য সব সময়ই পরিবেশবান্ধব।

টীকা

১। আকিরা যোশীবাওয়া বা ইয়োশিকাওয়া একজন আকিরা জাপানী অরিগামি শিল্পী। তাকে আধুনিক অরিগামির জনক বলে।

২। ফরাসি ‘পাপিয়ের মাশ’ এর বাংলা অর্থ ‘কাগজের মণ্ড’। তবে বাংলাদেশে এটি ‘পেপার ম্যাশ’ নামে বহুল পরিচিত।

৩। আর্মেচার (Armature) এর আভিধানিক অর্থ ডাইনামোর বা বৈদ্যুতিক মোটরের ভেতরকার প্যাঁচানো তারের কুণ্ডলী। বড় ধরনের পাপিয়ের মাশের কারুশিল্প তৈরিতে আর্মেচার অর্থাৎ ভেতরে প্যাঁচানো তারের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়।

৪। মুখোশ অর্থ মুখাবরক, মুখচ্ছদ, ছদ্মমুখ, নকলমুখ ইত্যাদি।

৫। ফরাসি শব্দ Coller থেকে কোলাজ, যার অর্থ কোনো কিছু আঠা দিয়ে লাগানো। কোলাজ হলো কোনো কিছু যেমন কাগজ বা কাঠ বা কাপড়ের টুকরোকে কাগজ, ক্যানভাস, কাঠ বা অন্যকিছুর উপরে লাগানোর মাধ্যমে শিল্পকর্মকে প্রকাশ।

৬। ফরাসি ‘পাপিয়ের কোলে’ শব্দটির উৎপত্তি ‘সাঁটানো কাগজ’ থেকে।

৭। আর্চাইভাল কার্ডবোর্ড তৈরি করা হয় সাধারণ কার্ডবোর্ডের অম্লত্ব দূরীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই কাগজ সাধারণত প্যাকিং বাক্স তৈরিতে লাগে।

৮। কাগজের কারুশিল্পের মোটিফের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যগুলো ধর্মীয় নানা ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান লৌকিক সংস্কার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভূদৃশ্য ও গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি এবং শিল্পীর সমসাময়িক কালের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। এসবের চিত্রগত, নকশাগত বা তৈরিকৃত কোনো কিছুর রূপই হচ্ছে মোটিফ।

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিভাগের ১ম বর্ষ বি.এফ.এ সম্মান প্রোগ্রামের একটি কোর্সের শিরোনাম। CRAFT 106 কাগজ ও কোলাজশিল্প (Paper & Collage Art)
পূর্ণমান : ৫০ (ইনকোর্স : ২৫ + পরীক্ষা : ২৫)

মাধ্যম : কাগজ, কাগজের মণ্ড (পেপার ম্যাশ) ও কোলাজ ব্যবহার উপযোগী উপকরণ ইত্যাদি।
বিষয় : উন্মুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

অরূপ চন্দ্র, ১৯৯৮। শিল্পের ব্যাকরণ, পশ্চিমবঙ্গ : সুজয়া প্রকাশনী।

একে এম আতিকুর রহমান, ২০০৯। চারুকলা পরিচিতি, ঢাকা : বাংলা প্রকাশ।

ওয়াকিল আহমদ, ২০০৭। লোকসংস্কৃতি, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

কমল আইচ, ২০১৯। শিল্পের শব্দার্থ সন্ধান, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।

ফজলে রাব্বি, ২০০২। ছাপখানার ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ড. বরণকুমার চক্রবর্তী, ২০০৫। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, ১৯৮৫। কুটির শিল্প, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ২০১৯। ফান্ডামেন্টাল অফ পাল্প এন্ড পেপার মেকিং, ঢাকা : বাংলাদেশ পাল্প এন্ড পেপার।

তোফায়েল আহমদ, ১৯৮৫। লোকশিল্প, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সিরাজুল ইসলাম, ২০০৩। বাংলাপিডিয়া খণ্ড ২, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সৈয়দ মাহবুব আলম, ১৯৯৯। লোকশিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

Edward L. Mattil, 1962. Meaning in Crafts. , The United States of America: Prentice-Hall, INC. Englewood Cliffs, N.J.

ইন্টারনেট

https://bn.wikipedia.org/wiki/কাগজ#ইতিহাস------- ১৯:৩১ টার সময়, ১৯ অক্টোবর, ২০১৯।
https://bn.wikipedia.org/wiki/ফানুস#ইতিহাস------- ০৭:২১ টার সময়, ১৭ এপ্রিল, ২০২০।